মুক্তবন্ধ

মুক্তবন্ধ

রমাপদ চৌধুরী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন, কলিকাতা ৯

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

প্রচ্ছদপট : সুধীর মৈত্র

তিন টাকা

সমুদ্রকে দিলাম

ঃ এই লেখকের ঃ

উপন্যাস

লা ল বা ঈ

প্রথম প্রহর

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

অরণ্য আদিম

দুটি চোখ দুটি মন

গল্প গ্রন্থ

পিয়াপসন্দ্

দরবারী

আপন প্রিয়

কথাকলি

কখনো আসেনি

প্রবন্ধ

রূপযানী

পত্রনবীশের শুভদৃষ্টি

ঝিনুকের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হলো, মালার বাঁধনের মধ্যে সে জীবনে নতুন ছন্দ পায়, অন্য এক পরিণতি। আমাদের জীবনও এমনি ছোট ছোট মুক্তোর কিংবা মুক্তির মালা। সে মালায় মিলের বাঁধন নেই, কিন্তু ছন্দের বাঁধন আছে। তাই এ বইয়ের নাম রাখলাম 'মুক্তবন্ধ'।

'ইম্‌লী' গল্পটি ১৩৫৯ সালে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সংখ্যাটি শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত সংগ্রহ করে দিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করবো না।

সূচীপত্র

আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া

আমার একেবারেই ইচ্ছে ছিলো না। বড়-জা জোর করে ঠেলে পাঠালো। বললে, 'নতুন, অত লজ্জা দেখাস নি। ঐ লজ্জা করে করেই আমরা সব হারিয়েছি, এখন তোদের দেখলে শুধু হিংসেয় জ্বলে-পুড়ে মরি।' বড়-জা আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাই বিয়ের পর যেদিন প্রথম আলাপ হলো, আমি বয়েসের এবং সম্পর্কের মান রাখবার জন্য প্রণাম করলাম, সেদিন থেকেই বড়-জা আমাকে 'তুই' বলতে শুরু করেছিলো। আর যে-হেতু আমি ওর ছোট দেওরের বউ, অর্থাৎ বাড়ির একেবারে আনকোরা নতুন বউ, সেই হেতু আমার নাম হলো, 'নতুন'। তা বড়-জা বললে, 'দেখ্ নতুন, যা কিছু ফুর্তিটুর্তি এখন করে নে, এরপর তো সারাটা জীবন আমাদের মত হাঁড়ি ঠেলতে হবে।' আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, অনভ্যাসের ঘোমটা টানতেও কেমন হাসি-হাসি পায়। তাই বড়-জার খোলাখুলি কথাগুলো শুনে কেমন লজ্জা-লজ্জা করতো। কিন্তু বড়-জা দমবার পাত্র নয়। তার দেওরটিকে বললে, 'ছোট্‌ঠাকুরপো, নতুনকে নিয়ে পুরী কি দার্জিলিঙ কোথাও বেড়িয়ে এসো দিনকয়েকের জন্যে। ওই যে হনিমুন না কি বলে, আমরা কি ছাই জানি আজকালকার রীতিনীতি।' তা শুনে এমনভাবে হাসলো গৌতম, তাকালো আমার দিকে যে বেশ বুঝতে পারলাম অমন একটা ইচ্ছে ওরও যে না হচ্ছে তা নয়। গৌতমের গোপন ইচ্ছেটা বুঝতে পেরে—না, আজকালকার মেয়েদের মত ওকে নাম ধরে ডাকতে আমি পারি না, পুরোনো দিনের বউদের মতই আড়েঠারে বুঝিয়ে দিই, তবু

সত্যি কথা বলতে কি, মনে মনে ওর নাম ধরে ডাকতে, নামটা মুখের মধ্যে লোফালুফি 'করতে বেশ লাগতো। কিন্তু বড়-জার সামনে তো আর নাম বলতে পারি না। তাই বললাম, 'ওর ইচ্ছে হয় যাক, আমি যাবো না।' বড়-জা রাগ দেখিয়ে বললে, ওরে আমার লজ্জাবতী লতা, যাবার ইচ্ছে নেই! · যা বলছি, শোন নতুন, ছুটিতে দিন-কয়েক কোথাও গিয়ে—'

ঠেলেঠুলেই এক রকম পাঠিয়ে দিলে। আমি আর গৌতম এসে উঠলাম পুরীর একটা হোটেলে। একেবারে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। সমুদ্র আমি আগে তো কখনও দেখি নি। দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অভিভূত হয়ে গেলাম। সমুদ্র এত সুন্দর! সমুদ্র এমন বিশাল! মনে হলো, কোথায় ছিলাম আমি এতদিন! এমন একটা রূপের পৃথিবী আছে আমি জানতামই না? আমার বুকের মধ্যেও যেন খুশীর ঢেউগুলো গুরগুর করতে করতে ফুর্তিতে ফেটে পড়তে লাগলো। ছেলেমানুষের মত আমার নাচতে, গাইতে, ছুটে যেতে ইচ্ছে হলো ঢেউগুলোর কাছে। কিন্তু তা না করে আমি গৌতমের উপর খুশী হয়ে উঠলাম, ঠায় ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসি হাসতে লাগলাম। আর ওর সুন্দর চোখজোড়ার দিকে, চোখের তারা ছুটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেমন ভাবতে ভালো লাগলো, ওর চোখ ছুটো যেন সমুদ্রের মত নীল, সমুদ্রের মত গভীর, সমুদ্রের মত বিশাল। আনন্দে আহ্লাদে ওর চোখের ছুটি সমুদ্রে ডুবে যেতে ইচ্ছে হলো, হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো।

ও বললে, 'কি দেখছো অমন করে? ওর বোধহয় একটু অস্বস্তি লাগছিলো। লাগবারই কথা। কেউ একজন হাতে চিবুক রেখে ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি লাগবে না?

কিন্তু আমি কি করবো। আমাকে তখন দুষ্টুমিতে পেয়েছে। বললাম, 'সমুদ্দর দেখছি।'

ও কেমন অপ্রতিভ হলো, হাসলো। বললে, 'আমি কি সমুদ্র নাকি?'

আমি আরো দুষ্টুমি করে সুর দিয়ে গেয়ে উঠলাম, 'তুমি হও গহীন গাঙ, আমি ডুইব্যা মরি!'

ও তিনটে আঙুলের হালকা থাপ্পড় দিলে আমার গালে। আমি খিলখিল করে হেসে উঠেই ছুটে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বালির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে দাঁড়ালাম একেবারে সমুদ্রের ধারে, বালির ওপর যেখানটাতে ঢেউগুলো ফেটে ফেটে ফেনা হয়ে পড়ছে, সেখানে।

না, ঠিক অতদূর নয়। ঢেউয়ের অত কাছে যেতে আমার কেমন ভয়-ভয় করলো। আমি তো তার আগে সমুদ্র দেখি নি, তাই অমন সুন্দর ঢেউগুলোকে যেমন ভালোও লাগলো তেমনি কাছে যেতেও কেমন একটা আতঙ্ক বোধ করলাম। অচেনা মানুষের কাছে যেতে হলে যেমন ভয়-ভয় করে, তেমনি। ঠিক কেমন, বলবো? ফুলসজ্জার রাতটার মত। ভালোও লাগছে, মনের মধ্যে বেশ একটা খুশীর গুনগুন, আবার অচেনা মানুষ গৌতমের এত কাছে যেতে হবে ভেবে কেমন এক ভয়-ভয়-ভাব।

হঠাৎ চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি কি গৌতমও এসে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার পাশটিতে, গা ঘেঁষে। আর আমারই মত তাকিয়ে আছে সমুদ্রের দিকে।

ছোট ছোট এক একটা দল পাড় ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলো। মেয়ে পুরুষ, ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেমেয়ে। যেই ঢেউ এসে পড়ছে, দু'একজন ছুটে যাচ্ছে সাদা ফেনায় পা ডোবাতে। ওদিকে জেলেদের ডিঙির সারি পড়ে আছে বালির ওপর, আর বালির উপর বসে বসে বড় বড় জালগুলো মেরামত করছে জেলেরা।

—এই, ওরা কি কুড়োচ্ছে, কি? আমি জিগ্যেস করলাম।

ও বললে, ঝিনুক।

ওমা, তাই নাকি! আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোট বড় নানা রকমের, সাদা আর রঙিন ঝিনুকের রাশি এসে পড়ছে ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ সরে গেলেই সেগুলো চিকচিক করছে বালির ওপর। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখলাম। কুড়োতে কেমন লজ্জা হলো। আমার বয়েসী অনেক মেয়েই ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এগিয়ে যাচ্ছিলো। আমি কেমন লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ, যারা সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো, তারা ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল আমার দিকে। মেয়েরাও। আমি দেখতে খুব সুন্দর, আমার চোখদুটো টানাটানা, আমার ঘাড়টা কি চমৎকার, আমার ফরসা সুডোল হাত দেখলে নাকি হাত বোলাতে ইচ্ছে করে, এমনি সব কথা বলে ইস্কুলের বন্ধুরাও আমাকে ক্ষ্যাপাতো, কলেজের মেয়েরা প্রশংসা করতো। কিন্তু সমুদ্রের পাড় দিয়ে যেতে যেতে ওরা যখন বার বার ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিলো তখন বেশ বুঝতে পারছিলাম রূপ দেখছিলো না ওরা। বয়স-হওয়া দুটি মহিলার হাসি দেখেই বুঝলাম ব্যাপারটা। আসলে ওরা বুঝতে পারছিল আমাদের সবে বিয়ে হয়েছে। ও ঠিক বোঝা যায়, আমি নিজেও তো কত মেয়েকে দেখেই ধরে ফেলতাম। বিয়ের পর চেহারাটাই কেমন অন্যরকম অন্যরকম লাগে। তাছাড়া সিঁথিতে সিঁদুরও বোধহয় একটু বেশী দিয়ে ফেলতাম তখন। একটু বেশী দূর অবধি।

ওরা তাকাচ্ছিল বলে লজ্জা নয়, সবে বিয়ে হয়েছে বলে লজ্জা নয়, বরং মজাই লাগছিলো। তবে লজ্জা হচ্ছিল ঝিনুক কুড়োতে, ওদের সামনে ওদের মত ঝিনুক কুড়োতে। কিন্তু সে আর কতক্ষণ। এক সময় দেখলাম, নিজেরই অজান্তে কখন হাসতে হাসতে আমিও ঝিনুক কুড়োতে শুরু করেছি, ঢেউয়ের ফেনায় পা ডুবিয়ে হাঁটছি। আর ঢেউ লেগে কাপড় ভিজে যাবে বলে কাপড়টা এক বিঘত তুলে ধরেছি। লজ্জা দূর হয়ে গেছে, ভয় ভেঙে গেছে তখন।

হাঁটতে হাঁটতে একটু অনুভবেই বুঝতে পারছিলাম যে গৌতম পিছন পিছন আসতে আসতে আমার ফরসা পা—পায়ের উন্মুক্ত অংশটুকুর দিকে তাকাচ্ছে।

এক বিঘত পা উন্মুক্ত করে হাঁটা এক জিনিস, আর সমুদ্রে স্নান করা অন্য। স্বামী বলেই তো বেশী অস্বস্তি। তা ছাড়া অত লোকের সামনে! না বাবা, আমি সমুদ্রে স্নান করবো না।

পরের দিন সকাল থেকেই নুলিয়াটা পিছনে লাগলো।—সমুন্দরে নাহাবে না দিদি।

ও বলে উঠলো, না, না, নুলিয়া লাগবে না। আমি কি নতুন নাকি এখানে! আরো কতবার এসেছি।

সত্যি, গৌতমের উপর এত হিংসে হচ্ছিলো। ও কতবার এসেছে, অথচ আমি কিনা এই প্রথম! এমন চমৎকার জায়গা ছেড়ে কোথায় ছিলাম এতদিন? যাক, এসেছি যখন চোখ ভরে দেখে নিই, প্রাণ ভরে নিশ্বাস নিই।

যেখানটায় সকলে স্নান করছিলো সেইখানটায় এসে বালির ওপর বসলাম দু'জনে। স্নান করতে করতে সবাই হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে। ঢেউ লেগে বালিতে লুটোপুটি খাচ্ছে মেয়েরা, দু-একজন পুরুষ ঢেউয়ের মাথায় লাফাতে লাফাতে অনেক অনেক দূর অবধি চলে যাচ্ছে। আর তারও ওদিকে, অনেক দূরের অথৈ জলে কালো-কালো ক্ষুদে-ক্ষুদে কয়েকটা ডিঙিতে করে মাছ ধরছে নুলিয়ারা। পাড় থেকে কেউ বা ডিঙি ভাসাবার চেষ্টা করছে, বার বার ফিরে আসছে ঢেউ লেগে।

ও বললে, কি, সমুদ্রে স্নান করবে না?

আমি আতঙ্কে হাত নেড়ে বলে উঠলাম, না বাবা, অত শখ নেই আমার।

—আরে দূর, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিয়ে যাবো তোমাকে,

দেখো গৌতম্ বললে—এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, যেন উনিও একজন নুলিয়া, সমুদ্রের সঙ্গে এত চেনাশোনা।

আমি মনে মনে বললাম, তোমাকেও আমি নুলিয়া না নিয়ে একা নামতে দেবো কিনা। বিয়ের পর বউয়ের কাছে সবাই অমন শিভালরি দেখাতে চায় গৌতমবাবু, আমি তা জানি।

মনে মনে এ-কথা ভাবতে ভাবতে আমি হঠাৎ ঠাট্টার সুরে ডাকলাম, ও গৌতমবাবু!

ও ফিরে তাকালো।

বললাম, কি দেখছেন স্যার?

—সমুদ্র।

বললাম, উঁহু। আমি জানি।

—কি?

হেসে উঠে বললাম, বলবো না।

সত্যি, মেয়েরা যে কি করে স্নান করছিলো আমার নিজেরই অবাক লাগছিলো। কখনো বালিতে গড়িয়ে পড়ছে, কাউকে স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারো কাপড়চোপড়—

একজনের অবস্থা দেখে তো আমি আর গৌতম হেসে লুটিয়ে পড়লাম। বেচারা শাড়িখানা হাতে নিয়েই টুপ করে বসে পড়লো গলা অবধি জলে ডুবিয়ে। কি করবে, জলের তোড়ে লাজলজ্জা রাখা দায়। আর কাপড়-জামা নামেই আছে, জলে ভিজে এমন অবস্থা, শরীরের কিছুই চাপা-ঢাকা থাকে না। পুরুষগুলোও কেমন ক্যাটক্যাট করে তাকিয়ে আছে দেখো।

আমি ইয়ার্কির ছলে গৌতমের চোখের দিকে তাকালাম।—এই। কি দেখছো মশাই অমন ড্যাবড্যাব করে?

ও হাসলো। আর আমি ভাবলাম, ওদের মত ও-ভাবে সমুদ্রের জলে নামতে পারবো না আমি এত লোকের সামনে। গৌতমের সামনে।

কিন্তু ইচ্ছেও যে না-হচ্ছিলো তা নয়। এক একবার ভাবছিলাম, মন্দ হয় না। বেশ তো জলে লুটোপুটি খাওয়া যায়। বিয়ের আগে এই তো সেদিনও ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে, আমরা তু'বোন ছাদে গিয়ে ভিজলাম। তবে হ্যাঁ, নুলিয়া না নিয়ে নামতে পারবো না। ওদের মত নুলিয়াটাকে হাত ধরতে দেবো না অবশ্য। মেয়েগুলো অমনভাবে নুলিয়াদের হাত ধরেই বা যাচ্ছে কেন ঢেউ কেটে কেটে! টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাবে, ভেসে যাবে, এই ভয়ে? তা একটু দূরেই নয় থাকবে নুলিয়াটা। না, এতদূর এসে সমুদ্রে স্নান না করে গেলে মনে খুঁতখুঁতুনি থেকে যাবে। বড়-জা হয়তো জিগ্যেস করবে, হ্যাঁ রে নতুন, সমুদ্রে নেয়েছিস তো রোজ? তারপরও অবশ্য ইয়ার্কি ঠাট্টা করবে তা জানি। বড়-জা অবশ্য বলেছিলো, আগে নাকি এসেছিল একবার রথের সময়। ননদরাও। এবার ওরা যদি সবাই আসতো ভালো হতো। সবাই মিলে সমুদ্রে স্নান করা যেতো। বড়-জা বেশ ভালো মানুষ। সত্যি, আমি কত সুখী, কত সুখী। কারো জীবনে যে এত সুখ থাকে বিয়ের আগে কল্পনাও করতে পারি নি।

গৌতম হঠাৎ হেসে উঠলো হো-হো করে। তন্ময়তা ভেঙে গেলো। সামনে তাকাতেই আমিও হেসে উঠলাম। ভীষণ মোটা একটা লোক সমুদ্রে নামছিলো, প্রথম ঢেউ লেগেই কাত। ফুটবলের মত গড়াতে গড়াতে ফিরে এলো বালির ওপর হুমড়ি খেয়ে।

আরে, এর মধ্যে এত চড়া রোদ উঠে গেছে? বালি তেতে উঠেছে।

—কি, নামবে না? গৌতম জিগ্যেস করলো।

আমি সায়ও দিলাম না, অমতও করলাম না। ভেতরে ভেতরে যে একটু ইচ্ছে না হচ্ছিলো তা নয়। গৌতম বললে, চলো তা হলে তেল তোয়ালে নিয়ে আসি, কাপড়টা বদলে আসি।

উঠে পড়লাম। হোটেলের নুলিয়াটা আবার সেলাম করলে।—নাহাতে যাবে না দিদি?

বললাম, যাবো, দাঁড়াও।

গৌতম বলে উঠলো, না না, নুলিয়া লাগবে না। আমি একাই পারবো তোমাকে সামলাতে।

আমার অবশ্য নিজের জন্যে তত ভয় হচ্ছিলো না, ভয় হচ্ছিলো ওর জন্যেই। বললাম, থাক্ না একজন সঙ্গে। সবাই তো নুলিয়া নিয়েই নামছে।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো গৌতম, আমার কথাটাকে কোন আমলই দিলো না। হেসে বললে, তুমি দেখছি সাজুন্তির চেয়েও ভীতু!

আমি কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, থেমে গেলাম। কারণ আমাদের দোতলার ঘরটির পাশের সিঁড়ি বেয়ে তেতলার সেই বউটি, যার সাজগোজের ঘটা দেখে আমরা 'সাজুন্তি' নাম দিয়েছিলাম, তাকে নেমে আসতে দেখলাম। পিছনে তার স্বামী।

চোখোচোখি হতেই বউটি হেসে বললে, যাবেন না সমুদ্রে স্নান করতে?

কি আশ্চর্য, ওই বউটা—যে কাপড় ভিজে যাবে এই ভয়ে ঝিনুক কুড়োবার সময়েও ঢেউয়ের কাছে যেত না, সেও চলেছে সমুদ্রে স্নান করতে? একটা সাদাসিধে শাড়ি পরেছে, গোলাপী রঙের টার্কিশ তোয়ালেটা বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধ অবধি ছড়িয়ে দিয়েছে স্বচ্ছন্দ বুকের ওপর দিয়ে, একরাশ ফাঁপানো চুলে ঢেকে গেছে সারা পিঠ।

নিজের অজ্ঞাতেই আমি গৌতমের দিকে তাকালাম। চোখ সরিয়ে নিলে ও, আর বউটির প্রশ্নের জবাবে, হেসে বললে, তখন থেকে তো ভয় ভাঙাবার চেষ্টা করছি।

আমি হাসলাম বটে, কিন্তু মনে মনে চটে গেলাম গৌতমের ওপর। আমি সমুদ্রকে ভয় পাই এ-কথাটা বউটিকে না শোনালেই কি চলতো

না? আর গৌতম বউটির দিকে অমন মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিলোই বা কেন? না হয় আমার চেয়ে একটু সাজগোজ বেশীই করে, দেখতে কি আমার চেয়ে সুন্দর?

বউটি এবং তার স্বামী হাসতে হাসতে নেমে গেলো। আমি চুল খুলে কাপড় বদলে নেমে পড়লাম একটাও কথা না বলে। গৌতম পিছনে পিছনে।

নুলিয়াটা আবার ধরলো বেরুবার মুখে।

গৌতম বললে, না, না, লাগবে না।

আসলে ওর মনে প্রথম থেকেই একটা বাহাদুরি দেখাবার নেশা ঢুকেছিলো বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। ও যেন সব জানে, সব বোঝে, সব পারে। প্রথম প্রথম ওর এই ভাবটা আমার বেশ ভালোই লাগছিলো। বেশ একটা নির্ভর করবার মত মানুষ যেন। কিন্তু যেখানে সত্যিই ভয় আছে সেখানে এই বাহাদুরির কি দরকার। দু'আনা পয়সা তো, তার বেশী আশাও করে না নুলিয়াটা। কিন্তু পয়সার জন্যে তো নয়, বরং পয়সা খরচ করতে পেলেই যেন খুশী হয় গৌতম। আসলে ওই অকারণ টাকা খরচ করার মধ্যেও যেন কি একটা বাহাদুরি লুকিয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারতাম, ও যেন আমার চোখে—তার নবপরিণীতা স্ত্রীর চোখে নিজেকে বড় করে তোলবার ফিকির খুঁজছে। কখনো অপ্রয়োজনে টাকা খরচ করে, কখনো সমুদ্রকে তুচ্ছ করে, কখনো বা হোটেলের ঠাকুর-চাকরকে ধমক দিয়েও বোধ হয় আমার কাছে ওর মূল্য বাড়াবার চেষ্টা করছিলো।

নুলিয়াটা কিন্তু নাছোড়বান্দা। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম সে এসে দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে।

গৌতম যখন ওকে তুচ্ছ করে আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে গেলো, নুলিয়াটা তখন শুধু বললে, কারিণ্ট আছে বাবু।

কিন্তু কে শোনে তার কথা। গৌতম টানতে টানতে আমাকে

তখন জলে নামিয়ে নিয়ে গেছে। ওর হাত ধরে ধরেই ঢেউয়ের ঘা খেতে খেতে ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কিছুটা গিয়ে আর সাহস হলো না। ও যত এগিয়ে যেতে চায় আমি তত বাধা দিই। শেষে হাল ছেড়ে দিলে ও, বললে, বেশ, তবে তুমি উঠে যাও, আমি একটু পরে উঠবো।

তখন ওর কথা আর কে ভাবে, নিজে পালিয়ে বাঁচতে পারলে হয়।

পাড়ে উঠে এসে চিৎকার করে বললাম, এই! বেশী দূর যেয়ো না।

কিন্তু বললেই কি আর শোনে। ঐ যে বললাম, ওর মনে তখন বাহাদুরি দেখানোর নেশা ঢুকেছে। বিয়ের পর তখন একটা মাসও কাটে নি, এ সময়ে নতুন বউটির চোখে নিজেকে নেপোলিয়ান বানানোর ইচ্ছা কোন স্বামীর না হয়। ও তাই আমার কথায় কান দিলো না।

আমার অবশ্য যেমন ভয়ও করছিল, তেমনি ভালোও লাগছিলো। সাজুন্তি ইতিমধ্যে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে, আর তার স্বামীটি স্নান করছে তখনও, কিন্তু নুলিয়ার হাত ধরে। তাকে দেখে আমি হেসেই ফেললাম। মেয়েমানুষেরও অধম, কি ভীতু রে বাবা ভদ্রলোকটা। মনে মনে ভয় পেলে কি হবে, গর্বও হচ্ছিলো গৌতমের জন্যে। ও একা একাই কতদূর এগিয়ে যাচ্ছে দেখো!

একটার পর একটা ঢেউয়ের মাথায় লাফ দিয়ে, কখনো ঢেউ ভেঙ্গে পড়ার মুহূর্তে টুপ করে ডুব দিয়ে ও তখন অনেক দূরে চলে গেছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম একবার, বোধহয় শুনতে পেলো না।

একি, এত দূরে চলে যাচ্ছে কেন ও? এতদূর চলে গেছে তখন গৌতম, যেখানে আশেপাশে আর একটিও লোক নেই।

সাজুন্তির স্বামী ততক্ষণে উঠে এসেছেন, আর বউটি গৌতমের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার স্বামীকে বললে, দেখো, দেখো, উনি কতদূর গেছেন।

বউটির চোখের দৃষ্টিতে গলার স্বরে সপ্রশংস ভাবটুকু দেখে গর্বে

বুক ফুলে উঠলো আমার। সত্যি, গৌতম যেন মুহূর্তের জন্যে নেপোলিয়ানের মত বীর হয়ে উঠলো আমার চোখে।

কিন্তু সাজুন্তি আর তার স্বামী হোটেলের দিকে চলে যেতেই আমার বুকের ওপর একটা আতঙ্কের পাথর চেপে বসলো।

আর ঠিক সেই মূহূর্তেই আমার মনে হলো, গৌতম যেন নিজে ইচ্ছে করে এগিয়ে যাচ্ছে না, গৌতম বুঝি বা স্রোতের টানে তাল রাখতে না পেরে ভেসে যাচ্ছে। হ্যঁা, তাই। হাত তুলে বার বার যেন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। যেন হাত তুলে চিৎকার করে বলছে, আমাকে বাঁচাও।

অতদূর থেকে তার চীৎকার এসে পৌঁছানোর কথা নয়। কিন্তু সমস্ত শরীর যেন মুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠলো আতঙ্কে, ভয়ে। মনে হলো, গৌতম ভেসে যাচ্ছে, স্থির মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভ্রান্তের মত আমি এদিক-ওদিক তাকালাম, কি করবো ঠিক করে উঠতে পারলাম না, নুলিয়াটাকে খুঁজলাম।

লোকটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে তখনও। অন্যমনস্কভাবে কি যেন দেখছে।

সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আমার, চোখ ঠেলে কান্না এলো। পাগলের মত হয়ে গেলাম আমি। ছুটে গেলাম নুলিয়াটার কাছে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে আমার দু'হাতের দুটো বালা খুলে তার হাতে গুঁজে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে অনুরোধ করলাম, ওকে বাঁচাও তুমি, বাঁচাও। ঐ দেখো ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে···

ঠিক কি বলেছিলাম, কি ভাবে বলেছিলাম, নিজেও জানি না। সেই মুহূর্তে আমার মাথার ঠিক ছিলো না।

কিন্তু নুলিয়াটার মাথার ঠিক ছিলো। সে বালা দুটো আমার হাতেই গুঁজে দিয়ে একবার তাকালো গৌতমের দিকে। বিড়বিড় করে কি যেন বললে, তারপর সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উঃ, সে যে কী উৎকণ্ঠায় এক ঘণ্টা কেটেছে, আজ ভাবলেও সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়, ঘুম আসে না কোনো কোনো দিন।

নুলিয়াটা একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে, একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে, আর আমার মনে হচ্ছে যেন কত সময় পার হয়ে যাচ্ছে। বালির ওপর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নিষ্ফল ছোটাছুটি, নিজেরই অজ্ঞাতে কখন আমিও জলের কাছে এগিয়ে এসেছি···

একটার পর একটা ঢেউ পার হচ্ছে নুলিয়াটা, আর আমার মন বলছে, পারবে না, পৌঁছতে পারবে না নুলিয়াটা, গৌতমকে বাঁচানো যাবে না।

এক নিমেষের জন্যে গৌতমের শরীরের কালো বিন্দুটুকু একটা মাতাল ঢেউয়ের মাথায় উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেলো। আর আমার পা দুটো থরথর করে কেঁপে উঠলো, মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো, চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেলো, সমুদ্রের গর্জন আর স্নানার্থীদের চিৎকার কোলাহল একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে গেল···আমি কি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি, আমি কি কানে শুনতে পাবো না আর?···বীভৎস একটা আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চেষ্টা করলাম আমি, তারপর বোধ হয় বসে পড়লাম বালির ওপর, কিংবা পড়ে গেলাম, কিংবা···

কি যে হয়েছিলো আমি জানি না।

একটু একটু করে যখন জ্ঞান ফিরে এলো, দেখলাম একরাশ লোক আমাকে ঘিরে আছে। মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে অচেনা এক ভদ্রমহিলা বাতাস করছেন আমাকে, আর নুলিয়াটা চোখের পাতা খুলতে দেখে একমুখ হাসি নিয়ে বলছে, বাবুকে জান বাঁচায় দিয়েছি, দিদি, বাবু বাঁচ গেছে।

ধীরে ধীরে আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, পাশে বসে ক্লান্তিতে অবসন্নতায় গৌতম তখনও ধুঁকছে।

ক্লান্ত অবসন্ন শরীর টানতে টানতে, নুলিয়াটার কাঁধে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে হোটেলে ফিরে এলাম। ফিরে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম। ঘুম, ঘুম, পরম তৃপ্তির ঘুম।

বিকেলের দিকে যখন হোটেলের সামনের বারান্দাটায় দু'খানা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে আমরা বসলাম, তখন আমার শরীরের ক্লান্তি দূর হয়েছে, কিন্তু গৌতমের সারা দেহে তখনও ব্যথা, অসহ্য ব্যথা। দৈত্যের মত শক্তিশালী অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে পরাজিত সৈনিকের মত ক্লান্ত আর লজ্জিত সে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা।

ইতিমধ্যে গুজবটা রটে গিয়েছিলো সারা হোটেলে। সকলেই একবার করে এসে সমবেদনা জানিয়ে যাচ্ছিলো, খোঁজ নিয়ে যাচ্ছিলো গৌতম কেমন আছে, আর লজ্জায় অস্বস্তিতে আমি মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলাম। মনে হচ্ছিলো, এই সমুদ্র ছেড়ে, এই হোটেল ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারলে যেন বাঁচি।

এক সময় সাজুন্তি আর তার স্বামী এসে দাঁড়ালো পিছনে—কেমন আছেন ?

গৌতম অপ্রতিভ হাসি হেসে তাকালো, বললে, ভালো। তারপর মাথা নিচু করলে।

আর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল তাঁকে নুলিয়ার হাত ধরে স্নান করতে দেখে আমরা হেসেছিলাম। পাশাপাশি দু'জনকে তুলনা করে গৌতমের দুঃসাহসের জন্যে গর্ববোধ করেছিলাম।

ওরা চলে গেলো। আমাদের চোখের সামনে দিয়েই সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তখনই চোখোচোখি হলো নুলিয়াটার সঙ্গে। সামনের রাস্তাটা দিয়ে যেতে যেতে সে ফিরে তাকালো আমার দিকে, হাসলো,

সেলাম করলো। তারপর চলে গেল নিজের কাজে। আর আমার সমস্ত মন কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো। ও না থাকলে আজ কি যে হতো। গৌতম বাঁচতো না, আমি বাঁচতাম না। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো বলবো তাকে। বিয়ের পর একটা মাসও যেতে না যেতে যদি আমার বাইশ বছরের যৌবন থমকে থেমে যেতো তা হলে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কি বলবো!

নিজেরই অজান্তে কখন যে হাতের তিন ভরি সোনার বালা দুটোয় হাত দিয়েছি টের পাই নি।

সচেতন হতেই একটা খুশির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। ভাবলাম, লোকটাকে এখনই ডেকে বালা দুটো দিয়ে দিলে হতো। ও আমার জন্যে যা করেছে, যা দিয়েছে, তার কাছে এটুকু দান কত তুচ্ছ!

কিন্তু লোকটা তখন অনেক দূর চলে গেছে। তাই ভাবলাম, থাক্, এত তাড়া কিসের, লোকটা তো আর চলে যাচ্ছে না, কাল সকালে যখন আবার আসবে তখনই দিয়ে দেবো।

পরের দিন সকালে গৌতম আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো। গতকালের সেই লজ্জা আর অস্বস্তি যেন ঝেড়ে ফেলেছে।

বললে, চলো, বেড়াতে যাবে না?

বললাম, চলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম সমুদ্রের পাড়ে, যেখানে অবিশ্রান্ত ঢেউ ফেটে পড়ছে তীরের ওপর, তা থেকে একটু দূরে। আগেকার মত কাছে যেতে ইচ্ছে হলো না। না, ভয় নয়, কেমন একটা বিতৃষ্ণা।

হঠাৎ দেখলাম নুলিয়াটা আর একজনের সঙ্গে কাঁধে একটা লাঠিতে বিরাট জালটা ঝুলিয়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। চোখোচোখি হলো। ও হাসলো। আমিও।

ভাবলাম, এখনই দিয়ে দেবো বালা দুটো? কিন্তু এই বালা

দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা, দু'গাছি চুড়িও তাই। নিয়ে ওর বউকে পরতে দেবে হয়তো, বিক্রি তো করবে না। আর চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? দুটোয় এক ভরি সোনা তো আছেই। তা ছাড়া, কৃতজ্ঞতার দাম তো সোনা দিয়ে যাচাই হয় না। আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড়-জা? বলবে হয়তো, 'দু'দিনের জন্যে গেলি নতুন, গিয়েই বালাজোড়া খুইয়ে এলি?' বলবে নিশ্চয়ই, কারণ বালার প্যাটার্নটা বড়-জার খুব পছন্দ হয়েছিল। তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেয়া যাবে নুলিয়াটাকে, ওর বউকে পরাতে বলবো।

কিন্তু এ-জায়গাটা ছেড়ে পালাতে না পারলে যেন শান্তি নেই। আমরা দু'জনে এই সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছি, অন্য সকলের মত সমুদ্র দেখছি, কিংবা কিছুই দেখছি না। অথচ ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে যারাই যাচ্ছে, ফিরে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে, আমার দিকে। আর তাদের সেই তীব্র দৃষ্টিতে আমি যেন উপহাস দেখতে পেলাম। যেন সকলেই হাসছে আমাদের দেখে। যেন বলাবলি করছে, যেমন বীরত্ব দেখাতে গিয়েছিল, উচিত শাস্তি হয়েছে।

সাজুন্তির চোখেও যেন এমনি এক উপহাস লুকিয়ে ছিলো। সেই দুটি টানাটানা কৌতুকে চঞ্চল চোখ, যে-চোখ প্রশংশায় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে বলে উঠেছিলো, 'দেখো, দেখো, উনি কতোদূর গেছেন!' সেই চোখজোড়া এখন যেন উপহাসে তীক্ষ্ণ।

আমি গৌতমকে বললাম, চলো, কাল সকালেই চলে যাই। আমার আর ভালো লাগছে না।

গৌতম সায় দিলো, তাই চলো।

কিন্তু যাওয়া হলো না। স্টেশন থেকে ফিরে এসে গৌতম বললে, বার্থ পাওয়া গেলো না। তিন দিন পরে একটা ব্যবস্থা হবে।

পরের পরের দিন সকালে নিত্যদিনের মতই সাজুন্তি আর তার

স্বামী নেমে গেলো আমার চোখের সামনে দিয়ে। তেমনি বুকের ওপর গোলাপী তোয়ালেটা বিছিয়ে, এক-পিঠ এলো চুলে একটা অকারণ ঝাঁকুনি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আমাদের ঘরের সামনে বউটি থমকে দাঁড়ালো, কিন্তু স্নান করতে যাবো কিনা সে-প্রশ্ন না করেই নেমে গেল। অর্থাৎ ওরা লক্ষ্য করেছে যে আমরা ঐ দুর্ঘটনার পর আর সমুদ্রে স্নান করতে যাই নি। শুধু কি লক্ষ্য করেছে? হয়তো বলাবলি করেছে নিজেদের মধ্যে, হাসাহাসিও।

বউটির ওপর অকারণেই চটে গেলাম আমি। থামলোই যদি আমার চোখের সামনে তা হলে একটাও কথা বললো না কেন? ভাবলাম, আমিও আর কথা বলবো না ওর সঙ্গে, উত্তর দেবো না কোনো প্রশ্নের।

কিন্তু ওরা যখন স্নান সেরে ফিরছে, মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল সিঁড়ির বাঁকে। আর হঠাৎ কথার ফোয়ারা হয়ে উঠলো বউটি—। শুনেছেন? আজ আবার একজন ডুবে যাচ্ছিলো, একটা বুড়ো। নুলিয়ারা গিয়ে বাঁচালো তাঁকে।···কেউ ডুবে গেলে বাঁচানো কাজ ওদের, নুলিয়াদের। শুনলাম গরমেণ্ট নাকি টাকা দেয় সেইজন্যে। সত্যি? নুলিয়ারা না থাকলে কি যে হতো।···আর আজ কি সাংঘাতিক জোয়ার ছিলো, দেখলেন না তো!

অনর্গল কথা, অনেক কথা বলে গেলো বউটি। আমি শুধু ম্লান হাসলাম একটু। আর বউটি চলে যেতেই আমি গৌতমকে বললাম, এই! নুলিয়ারা নাকি টাকা পায় গরমেণ্টের কাছে, কেউ ডুবে গেলে বাঁচাবে বলে?

—কই শুনিনি তো! গৌতম বললে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, ওপরতলার বউটি'যে বললে। ওই সাজুন্তি।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে আমি ঐ কথাই ভাবছিলাম, আর আনমনে চুড়ি দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। চুড়ির প্যাটার্নটা দিদি পছন্দ

করেছিলো। দিদি! দিদির কথা মনে পড়লেই আমার এত ভালো লাগে। দিদির মত আমাকে বোধ হয় আর কেউই ভালোবাসে না। গৌতমও নয়। বিয়ের যত ঝামেলা তো দিদিই মাথায় করে নিয়েছিলো। বাজার করা, ডেকরেটর ডাকা, শ্বশুরবাড়ির লোকদের আদর আপ্যায়ন।—বাবা বুড়ো মানুষ, কত দিক আর সামলাবেন? দাদাটা তো আড্ডা আর হকি-ক্রিকেট নিয়েই আছে।

দিদি বিয়ের পর একটা উপদেশ শুধু দিয়েছিলো। বলেছিলো, ত্যাখ নমি, গায়ের গয়নাগুলো—বাবা যা দিয়েছেন তোকে-আমাকে, এগুলো লোক দেখাবার জন্যে নয়, সাজগোজের জন্যেও নয়। এগুলোই আমাদের ব্যাঙ্ক, আমাদের ভবিষ্যৎ। খেয়ালের বশে যেন এগুলো বিক্রি করিস না, হাজার অভাব-অনটন হলেও না।

আচ্ছা, অভাব-অনটন হলেও যা বিক্রি করতে নিষেধ করেছিলো দিদি, তা যদি নুলিয়াটাকে দিয়ে দিই তা হলে কি দিদি রাগ করবে? দিয়ে অবশ্য দেবো না। দিতে আমার নিজেরই তেমন ইচ্ছে এখন আর হচ্ছে না। কেন দেবো, সাজুন্তি যে বললে, ওরা গরমেণ্টের কাছ থেকে টাকা পায়। ডুবন্ত মানুষ দেখলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ। তা ছাড়া ডিঙি করে কত মাছ ধরে আনে ওরা, বিক্রি করে। নেহাত গরীবও ওরা নয়। এক একজনকে স্নান করিয়ে দিতে দু'আনা করে নেয়, তাতে কম টাকা রোজগার হয় নাকি ওদের! আমি অবশ্য অকৃতজ্ঞ নই। নুলিয়াটা সত্যিই তো গৌতমকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। ও না থাকলে, আজ কি দশা হতো আমার? কোন মুখ নিয়ে বাড়ি ফিরতাম? তাছাড়া, সারা জীবনটাই তো নষ্ট হয়ে যেতো, এই বাইশ বছর বয়সে—। না, নুলিয়াটাকে কিছু একটা দিতেই হবে। আংটিটা দিলে কেমন হয়। আমার তো অনেকগুলো আংটি। চেনা-অচেনা অনেকেই তো আংটি দিয়েছে। মুক্তো-বসানো যেটা, সেটা অবশ্য দেবো না। আর জামাইবাবু যেটা দিয়েছে সেটা খুব সুন্দর দেখতে!

ওটা রেখে দেবো। না রাখলে জামাইবাবু কি ভাববে? যদি কোনদিন পরতে বলে। ওটা দিয়েছি শুনলে জামাইবাবু খুব দুঃখ পাবে। জামাইবাবু সত্যি খুব ভালোবাসে আমাকে, খুব। এক এক সময় মনে হয় দিদিকেও যেন অত ভালোবাসে না। তা অবশ্য সত্যি নয়। বউয়ের চেয়ে কেউ কি আর শালীকে বেশী ভালোবাসতে পারে? মোটেই না। জামাইবাবুটা ভারি ফাজিল, আর ভারি দুষ্টু। ও ইচ্ছে করেই অমন ভাব করে। আমি কি আর বুঝি না! দিদিকে রাগাবার জন্যেই অমনি করে। রাগলে দিদিকে খুব সুন্দর দেখায় কিনা।

রাগলে দিদিকে যে খুব সুন্দর দেখায়—আমি কিন্তু কোনদিন লক্ষ্য করি নি। গৌতমই প্রথম বলেছিলো। সেই যে দিদির বাড়ি গিয়ে সব মিষ্টিগুলো খেতে পারে নি গৌতম, আর দিদি তাই রেগে গিয়েছিলো—তারপরই বলেছিলো ও, বলেছিলো, তোমার দিদি রেগে গেলে খুব সুন্দর দেখায় কিন্তু ওঁকে।

গৌতম রেগে গেলে আমার মোটেই ভালো লাগে না। তাই দু'দিন পরে, যাবার আগের দিন বিকেলে ও যখন রুক্ষ গলায় বললে, জিনিসপত্তর গোছগাছ করছি না কেন, তখন আমার খারাপ লেগেছিলো। কই, বিয়ের পর থেকে একটা দিনও তো অমনভাবে কথা বলে নি ও। হঠাৎ এমন রাগ-রাগ ভাব কেন? আসলে ও বোধহয় ভেবেছিলো আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে নেই। আর ও তখন পালাবার জন্যে অধীর! প্রতি মুহূর্তে বেচারার মনে অদ্ভুত এক লজ্জা। কি, না, সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছিলো লোকটা! ভাবলে, আমার নিজের হাসি পায়। সত্যি, কি কাণ্ডটাই না করলো গৌতম। বড়-জা বলেছিলো হনিমুন করে আসতে। ভালো হনিমুনই হলো বটে।

কিন্তু সারাটা বিকেল, সারাটা সন্ধ্যে কেমন গম্ভীর-গম্ভীর ভাব, সারা মুখ যেন থমথম করছে গৌতমের। অপ্রয়োজনে একটা কথাও

কথাও যেন বলতে নারাজ। ওর এই মুখের ভাব দেখে কথাটা বলতে সাহস হলো না, অথচ ওকে না বলে তো আংটিটা দেয়া যায় না।

ভাবলাম, থাক, কাল সকালে নিশ্চয় মনটা ভালো থাকবে ওর. তখনই বলবো। আর নুলিয়াটাও তো কাল সকালেই আসবে, তখনই দেয়া যাবে গৌতমকে জিগ্যেস করে।

গৌতমকে জিগ্যেস করে আংটিটা দিতাম ঠিকই। আর গৌতম নিশ্চয়ই আপত্তি করতো না, কিন্তু পরের দিন সকালে যে এত তাড়াহুড়া হবে আমি কি ছাই জানতাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে এমনিতেই দেরি হয়ে গেলো। এলার্ম দিয়ে রেখেছিলাম টাইমপীসে, কিন্তু এলার্মের দম দিয়ে রাখতেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই সেটাও বাজে নি, ঘুমও ভাঙে নি। যখন ঘুম ভাঙলো তখন আর এক ঘণ্টাও সময় নেই।

গৌতম চা খেয়ে চলে গেল হোটেলের হিসাব মেটাতে। ফিরে এসে বিছানাপত্তর গোছগাছ করতে লেগে গেলাম দু'জনে। সংসার ছড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম এ-ক'দিন। টুকিটাকি জিনিসপত্তরগুলি তো নেহাত কম ছিলো না। আগের দিন কিছু কিছু বাঁধাছাঁদা হয়েই ছিলো, কিন্তু চিরুনি, টুথব্রাশ, পাউডার, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নিতে সময় লাগলো।

আর এ-সব করতে গিয়ে নুলিয়াটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

বাক্স-বেডিং সব রিক্‌শায় তুলে সবে রিক্‌শাওয়ালা প্যাডেলে পা দিয়েছে অমনি দেখি কি নুলিয়াটা আসছে সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে।

রিক্‌শা চলতে শুরু করেছে তখন। আমাদের দেখতে পেয়ে এক-মুখ খুশির হাসি হাসলো নুলিয়াটা, সেলাম করলে। সেলাম করল বোধহয় বকশিশের লোভেই।

ছি ছি, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম ওর কথা। এত খারাপ লাগলো আমার। রিক্‌শাওয়ালাকে থামতে বললাম।

গৌতমকে বললাম, এই দেখো তো তোমার ব্যাগটা, ওর বকশিশটা দেয়া হয় নি। গৌতম বললে, টাকা তো তোমার বটুয়াতে।

তাই তো। খেয়ালই ছিলো না। আমার হাতেই তো বটুয়াটা। লাল ভেলভেটের ওপর সুন্দর নকশা-করা বটুয়াটা এখানেই কিনেছি—মন্দিরে যেদিন গিয়েছিলাম সেই পাণ্ডার ছরিদারটার সঙ্গে, সেদিন।

বটুয়া খুলে দেখলাম, দশ টাকার নোটই চার পাঁচখানা, খুচরো মাত্র ছুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা।

কি করি, স্টেশনে পৌঁছেই তো রিক্‌শার ভাড়া দিতে হবে। কুলির পয়সা দিতে হবে। সব খুচরোগুলো তো দিয়ে দেওয়া যায় না।

তাই একটা এক টাকার নোট বের করে নুলিয়াটার হাতে তুলে দিলাম। ও খুশী হয়ে সেলাম করলে। হাসলো। বললে, ফির আসবেন বাবু, সেলাম দিদি, সেলাম।

সেলাম জানিয়ে চলে গেল লোকটা। আর আমার এত ভালো লাগলো তাকে। এত ভালো।

ফিরে এসেই বড়-জাকে বললাম, জানেন দিদি, নুলিয়াগুলো এত ভালোমানুষ এমন চমৎকার।

বড়-জা হাসলো। বললে, দেখিস নতুন, এত ভালো ভালো বলিস না, ঠাকুরপোর আবার হিংসে হবে।

আমি হেসে ফেললাম। তারপর বললাম, ওমা—আসল কাণ্ডটার কথাই তো বলি নি, রীতিমত একটা কাণ্ড।

—কি কাণ্ড? চোখ কপালে তুললো বড়-জা।

আমি বললাম, আপনার ঠাকুরপো আর একটু হলেই তো ডুবে যেতো। একটা নুলিয়া দেখতে পেয়েই সাঁতরে গিয়ে বাঁচালো।

লোকটা নিজেই দেখতে পেয়েছিলো। ওরা তো সমুদ্রে চান করাতে দু'আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটা টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।

বলতে বলতে হঠাৎ কেন জানি না একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, সেদিনের সেই আতঙ্কের দৃশ্যটুকু চোখের সামনে ভেসে উঠেছিলো। বড়-জা কি যেন বললে, আর আমার তন্ময়তা ভেঙে গেলো। ভাবলাম, সত্যিই কি বালা দুটো দেবো বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধহয় না। সে-সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিলো? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমিই জানি! না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলি নি। তা ছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করে ছিলো নাকি নুলিয়াটা? কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিলো। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।

পাঠক

আমি স্বনামধন্য বিজন ঘোষ রায়। স্বনামধন্য শব্দটার অর্থ বোধহয় এই যে আপন নামেই পরিচিত, অন্য পরিচয় যাঁর প্রয়োজন হয় না। আমার ধারণা, আমার নাম শুনেই আপনারা আমার পরিচয় বুঝতে পেরেছেন। হ্যাঁ, আমি সেই বিখ্যাত লেখক, যাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস পড়তে চান, আপনাদের এত প্রিয়। আপনারা যে আমার লেখা গল্প-উপন্যাস পড়তে চান, পড়তে ভালবাসেন, তা আমি বুঝতে পারি আমার বইয়ের কাটতি দেখেই। কাটতি অবশ্য এমন অনেক লেখকেরই আছে যাঁদের আপনারা সাহিত্যিক বলে স্বীকার করেন না, অথচ সময় কাটানোর জন্যে যাদের বই আপনারা খবরের কাগজে মলাট দিয়ে নিয়ে পড়েন। আমি যে সে-দলের নই, তার প্রমাণ উন্নাসিক পত্রিকা-গুলোতেও সাহিত্য সমালোচনার নামে কখনো কখনো আমার শ্রাদ্ধ করা হয়। এবং সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, এই সব উন্নাসিক পত্রিকাও আমার কাছে লেখা চান তাঁদের বিশেষ সংখ্যার জন্যে, পেলে, ধন্য মনে করেন। না পেলে ক্রুদ্ধ হয়ে আরো কঠোর সমালোচনা করেন। বিশ্বাস না হয় তো আমার কাছে এসে দেখে যেতে পারেন, বিরুদ্ধে যে-সব পত্রিকায় যে-মাসে সমালোচনা বেরিয়েছে তার মাস কয়েক আগেই সেই পত্রিকার সম্পাদক আমার কাছে গল্প বা প্রবন্ধ বা যা-হোক একটা কিছু চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে প্রার্থিত বস্তুটি পেলে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করবেন। এ থেকে আমি একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, পাঠকদের চেয়ে আমি সম্পাদকদের কাছেই বেশী প্রিয়। তার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে, আমার রচনা ভাঙিয়ে তাঁরা দু'পয়সা রোজগার করতে পারেন। অবশ্য বিনিময়ে তাঁরা আমাকে

যথেষ্ট পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। এমন কি অনেক সময় আমার একটি গল্পের জন্যে তাঁরা যে পারিশ্রমিক দেন—পারিশ্রমিক না বলে তাঁরা অবশ্য বলেন সম্মানদক্ষিণা—তা আমার মাসিক বেতনের কাছাকাছি।

হ্যাঁ, যদিও আমি বিখ্যাত সাহিত্যিক বিজন ঘোষ রায়, যদিও শত সহস্র পাঠকপাঠিকার ধারণা আমি স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ধনী বিদ্বান ও বিচক্ষণ, তবু স্বীকার করছি যে তাঁদের ধারণা আমাকে লজ্জা দেয়। তাঁরা মনে করেন যে, আমি টাকার অভাব কি বস্তু তা জানি না, আমি শখ করে চাকরি করি এবং আমি আছি বলেই এই ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি একশো টাকা বেতনের একজন কনিষ্ঠ কেরানী মাত্র। এবং চাকরিটা আমাকে রাখতে হয়েছে এই কারণেই যে, আমার রচনার ওপর আপনাদের যতটুকু আস্থা আছে, আপনাদের ওপর আমার আস্থা তার শতাংশের একাংশও নেই। নেই, কারণ, ইতিমধ্যেই আমি দেখেছি আপনারা সুখেন মল্লিকের রচনা সম্বন্ধেও কিছু কিছু ঔৎসুক্য দেখাচ্ছেন। তার সম্পর্কেও আপনারা আলোচনা করেন, তার বইও আজকাল কিছু কিছু বিক্রি হয় এবং আমি বিজন ঘোষ রায় আজকাল চেষ্টা করেও বিজন ঘোষ রায়ের মত লিখতে পারি না। কারণ আপনারা যে বিজন ঘোষ রায়কে চেনেন, ভালবাসেন, যার লেখা আপনাদের এত ভাল লাগে সে আমার চেয়ে পনেরো বিশ বছরের ছোট। আমি চেষ্টা করেও সেই বয়সে ফিরে যেতে পারি না, সেই অনভিজ্ঞ কল্পনার উচ্ছ্বাস আঁকতে পারি না, চিন্তাহীন উত্তাপ সঞ্চার করতে পারি না আমার রচনায়। কিন্তু সুখেন মল্লিক তা পারে। সুখেন মল্লিক আমার চেয়ে দশ পনেরো বছরের ছোট এবং সম্ভবত জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তাই তার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

শুধু জীবন-যৌবনের অভিজ্ঞতাই আমার কল্পনা, আমার মনের

উত্তাপ কেড়ে নেয় নি। সুখেন মল্লিক হয়তো এখনো জানে না, যে মোহে সে জীবনকে শুধুমাত্র বিখ্যাত করতে চায় সে মোহ কতখানি মিথ্যা। বিখ্যাত হওয়ার পর সুখেন মল্লিকও বুঝবে খ্যাতির কোন মূল্য নেই। শুধু তাই নয়, খ্যাতি তাকে মানুষ হিসেবেও মিথ্যে করে দেবে।

আমি বিজন ঘোষ রায় আজ সেই মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, আমার আজকের রচনা পড়ে যখন পাঠক প্রশংসা করে তখন আমি বেশ বুঝতে পারি, সে সেই বিগত-যৌবনা প্রেমিকার মন নিয়ে যৌবনের প্রেমিককে ভালবাসছে। এই মিষ্টি স্মৃতির চোখ দিয়ে দেখলে চল্লিশোত্তর প্রৌঢ়ের টাকের ওপরও যেমন কোঁকড়ানো চুল কল্পনা করা যায়, তেমনি এঁরা আমার রচনার মধ্যেও সেই পুরোনো দিনের রস খুঁজে পান। খুঁজে পান না, তবু নিজেরাই মনে মনে সেটুকু বানিয়ে নেন।

আর তাই আমার কাছে তাঁদের চাহিদা বেড়েই চলে। বেড়ে চলে বলেই সম্পাদক এবং প্রকাশকরাও আমাকে এত আদর করেন। কিন্তু আমি জানি, সুখেন মল্লিক একদিন আমার চেয়ার উল্টে দিয়ে নিজেই বসবেন এ জায়গাটিতে।

আমি সুখেন মল্লিককে পছন্দ করি, সুখেনের লেখা আমার ভাল লাগে, সুখেন মল্লিক আমাকে শ্রদ্ধা করে এবং সুখেনের রচনায় আমার কিছু কিছু প্রভাব আছে এ-কথা পাঠকরাও বলেন। আমি সুখেনকে ভালবাসি, তার কারণ আমি সুখেন মল্লিককে ভয় পাই না। কিন্তু আমি আপনাদের ভয় পাই। কারণ আপনারা সুখেনকে ভালবাসতে শুরু করলে আমাকে আর ভালবাসবেন না। কারণ যেদিন থেকে আপনারা আমার লেখা পছন্দ করতে শুরু করেছেন সেদিন থেকে নিত্যানন্দ রায়ের লেখা আপনাদের আর পছন্দ হয় নি। সেই বিখ্যাত নিত্যানন্দ রায়, বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের স্রষ্টা হিসেবে যাকে

আজও অভিহিত করা হয়, অথচ যাঁর বই আজকাল আর তেমন বিক্রি হয় না।

দশ পনেরো বছর আগে আপনারা যখন আমাকে তরুণ লেখক বলে অভিহিত করতেন সেই সময় নিত্যানন্দ রায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। কি কারণে জানি না, তিনি আমাকে স্নেহ করতেন, আমার রচনার প্রশংসা শুধু আমার সামনেই নয় আমার অনুপস্থিতিতেও নানা সভাসমিতিতে এবং নানা সুধীজন সমক্ষে করেছেন। আমিও অবশ্য তখন তাঁকে যোগ্য সম্মান জানিয়ে এসেছি। তারপর এক সময় আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম আমি তরুণ লেখকের বেঞ্চি ছেড়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগিয়ে কখন যেন প্রবীণ লেখকের চেয়ারটিতে এসে বসেছি, কখন থেকে যেন জনপ্রিয় হয়ে গেছি, প্রশংসা পেতে শুরু করেছি সুধী পাঠকদেরও—এবং কি আশ্চর্য, নিত্যানন্দ রায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করেছি। তাঁর ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখতে পেয়েছিলাম এমন নয়, বরং তিনি আগের তুলনায় একটু বেশী ভদ্র ব্যবহারই করতেন আমার সঙ্গে, কথাবার্তা বলতেন এমন ঢঙে যেন আমি আর তাঁর অনুজপ্রতিম নই, তাঁর সমকক্ষ, কিন্তু তবু বুঝতে পারতাম আন্তরিকতার কোথায় যেন অভাব ঘটেছে। মাঝে মাঝে কানে আসতো তিনি কোন সাহিত্যসভায় আমার নিন্দা করেছেন, কোন তরুণ লেখকের কাছে বলেছেন, আমার বই আদপেই বিক্রি হয় না, এবং যদি বিক্রি হয় তো এই কারণে যে, আমি পাঠকের মুখের দিকে তাকিয়ে লিখি এবং পাঠকরা সকলেই নির্বোধ। এ-সব কথা শুনে আমি বিস্মিত হতাম এবং কৌতুক বোধ করতাম। বিস্মিত হতাম, কারণ নিত্যানন্দ রায়ের এই ব্যবহারের প্রকৃত কোন কারণ আমি খুঁজে পেতাম না। বিস্মিত হতাম, কারণ নিত্যানন্দ রায়ও একদা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উঠেছিল এক সময় এবং তাঁর পাঠকদেরও তখনকার প্রবীণ সাহিত্যিকরা নির্বোধ

বলতেন। কিন্তু যেদিন শুনলাম, নিত্যানন্দ রায় বলেছেন যে, আমি বিজন ঘোষ রায় টাকার জন্য লিখি, সেদিন আমি প্রচুর হেসেছিলাম।

হেসেছিলাম এই জন্য যে, আমি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও আমি যে ব্যাঙ্কে একশো টাকা বেতনের কনিষ্ঠ কেরানীর চাকরি করি—নিত্যানন্দ রায়ের সেই ব্যাঙ্কেই পঞ্চাশ হাজার টাকার অ্যাকাউণ্ট ছিল। তাছাড়া তিনি বাড়ি গাড়ি এবং আরো অনেক কিছুই করেছিলেন এবং সবই তাঁর অক্ষয় কলমটির দৌলতে।

টাকার জন্যে লেখায় আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু টাকা না হতেই সেই অভিযোগের সম্মুখীন হতে আপত্তি ছিল। নিত্যানন্দ রায় কি ভাবতেন জানি না। তবে ব্যাঙ্কে মাঝে মাঝে যখনই আসতেন তখনই আমার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলতেন এবং এমন একটা ভাব দেখাতেন •যেন তিনিই আমার নিয়োগকর্তা, যেন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর আমার চাকরির স্থিতি এবং বিনাশ নির্ভর করছে।

এই ব্যবহার আমাকে সহ্য করে যেতে হতো, কারণ আমাদের ব্যাঙ্কের এজেণ্ট নিত্যানন্দ রায়কে খাতির করতেন তাঁর অ্যাকাউণ্টটির জন্য এবং আমি তাঁকে খাতির করে চলতাম তাঁর সাহিত্যখ্যাতির জন্য। মনে মনে আমি অবশ্য নিত্যানন্দ রায়কে ক্ষমা করবার চেষ্টা করতাম, কারণ আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, নিত্যানন্দ রায় যা করেন তা ইচ্ছাকৃত নয়, তাঁর নিজের ওপর আস্থার অভাব ঘটেছে বলে এবং আমার ক্রমবর্ধমান খ্যাতিকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না বলেই তিনি আমার ওপর বিরূপ হয়ে উঠেছেন। এটুকু বোঝবার ক্ষমতা আমার ছিল বলেই আমি হাসতাম, কৌতুক বোধ করতাম এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতাম যে, এ ধরনের কোন ক্ষুদ্রতা আমি কোনদিন দেখাবো না। সুখেন মল্লিক যদি সত্যি কোনদিন বিখ্যাত হয়, জনপ্রিয় হয় এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেও সক্ষম হয় তা হলেও তাকে আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবো না।

অন্তত নিত্যানন্দ রায় সেদিন যা করলেন, তেমন ব্যবহার—

নিত্যানন্দ রায় সেদিন ব্যাঙ্কে এসে আমার কাউণ্টারের সামনে দাঁড়ালেন আমিরী চালে, তারপর পাশ বইটা এগিয়ে দিলেন : বিজন, এটা আপ-টু-ডেট করে দাও তো হে!

বললেন এমন ভাবে যেন আমি তাঁর কর্মচারী। তিনি আমাকে একদা স্নেহ করতেন এবং আমি তাঁকে এখনো শ্রদ্ধা করি বলেই যে তিনিও আমাকে নিছক একজন কেরানী ভাববেন আমি তা আশা করি নি।

তাই উষ্মা গোপন করে বললাম, এখন তো হবে না, আপনি রেখে যান, আমি পরে করে রাখবো।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এ ব্যাঙ্ক থেকে অ্যাকাউণ্ট তুলে নেবো।

বলে রাগে দপদপ করে পা ফেলে এজেণ্টের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সুখেন মল্লিক সেদিনই ভীরু ভীরু শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালো আমার কাউণ্টারের সামনে, বললে, বিজনদা, একটা উপকার করতে হবে।

বললাম, কি উপকার ভাই?

সুখেন বললে, একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে দিতে হবে আপনার ব্যাঙ্কে।

আমার ব্যাঙ্ক! হাসলাম আমি, তারপর ব্যবস্থা করে দিলাম। ব্যবস্থা করে দিয়ে নিত্যানন্দ রায়ের কথা বললাম তাকে। বললাম, এজেণ্টের কাছে গিয়েছিলেন কমপ্লেন করতে। তিনি বলেছেন, পাশ বইয়ের এনট্রি সঙ্গে সঙ্গে করা যাবে না।

আমরা দু'জনেই খুব হাসলাম।

আর সুখেন বললে, বিজনদা আপনার প্রশংসা করে সকলেই, ওঁর লেখা তো কেউ পড়ে না আজকাল, তাই এত রাগ। ওঁর ধারণা আপনি নাকি লাখ লাখ টাকা…

লাখ লাখ টাকা না হলেও বেশ কয়েক হাজার টাকা সত্যিই আমি রয়ালটি হিসাবে পেয়েছিলাম, পাচ্ছিলাম। কিন্তু স্বল্প বেতনের চাকরি করে সে টাকা বিশেষ জমাতে পারতাম না। অথচ সুখেন মল্লিক যে কি করে টাকা জমাতো বুঝতে পারতাম না।

ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খোলার পর ও প্রায়ই আসতো এবং একটা না একটা চেক জমা দিয়ে যেত। প্রথম প্রথম আমি ভাবতাম ওর বই তেমন বিক্রি হয় না, অবুঝ ছেলেছোকরারাই ওর বই পড়ে। কিন্তু ওর বইয়ের কাটতি ধরা পড়তো প্রকাশকদের কাছ থেকে পাওয়া চেক জমা দিতে দেখলেই।

এমনি করেই দিন কাটছিল। এবং কখন থেকে জানি না সুখেনের ওপর আমি চটতে শুরু করেছিলাম। বোধ হয় ঘন ঘন ওর চেক জমা পড়তো বলে। তা ছাড়া তরুণতর যে সব লেখক এবং সম্পাদকরা আমার কাছে আসতো মাঝে মাঝে তাদের মুখে সুখেনের প্রশংসা শুনে শুনে আমিও বিষিয়ে উঠতাম।

সুখেনের ব্যবহারেও ইদানীং কিছু কিছু আত্মম্ভরিতা লক্ষ্য করলাম এবং বেশ বুঝতে পারতাম সুখেন মল্লিক ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

সেদিন কি একটা কাজে এজেণ্টের ঘরে ডাক পড়েছে। কাগজ-পত্র নিয়ে যেতেই তিনি বসতে বললেন। তারপর কাগজপত্রে সই করতে করতে বললেন, কি লিখছেন বিজনবাবু?

বললাম, কিছু না।

তিনি হেসে বললেন, লিখুন, লিখুন। নতুন কিছু লিখুন মশাই। সুখেন মল্লিকের লেখা পড়েছেন? ওই ধরনের নতুন কিছু।

বললাম, পড়েছেন নাকি ওর লেখা?

—পড়ি নি মানে? চোখ তুলে তাকালেন তিনি। বললেন, পাওয়ারফুল লেখক যাই বলুন।

অতৃপ্ত বিরক্ত মন নিয়ে ফিরে এসে দেখলাম কাউন্টারের সামনে নিত্যানন্দ রায়। বহুদিন পরে হঠাৎ আবার এসেছেন কেন?

নিত্যানন্দ রায় একটা চেক এগিয়ে দিলেন, টাকা তুলবেন।

টোকেনটা নিয়েই মিষ্টি করে প্রশ্ন করলেন, কিছু লিখছো টিকছো? লেখা ছেড়ে দিলে নাকি?

বললাম, লিখে আর কি হবে, কার জন্যে লিখবো বলুন। যেমন অর্বাচীন সব পাঠক হয়েছে, সুখেন মল্লিকের ওই সব ভেল্কিবাজী পছন্দ করে তারা।

হেসে উঠলাম দু'জনেই। হাসি থামিয়ে নিত্যানন্দ রায় বললেন, যা বলেছো, পাঠক ছিল আগেকার দিনে, এখন আর সে পাঠক নেই।

শুধু কেরানী

আমরা পাঁচজন এ-আপিসে, এই রেকর্ড সেকশনে, একসঙ্গে ঢুকেছিলাম। কিন্তু কেউ কাউকে চিনতাম না। আমি, রেণুকাদি, অপর্ণা এবং আরো দু'জন, যারা এখন আর এ-আপিসে নেই। সুজাতা চলে গেছে অন্য আপিসে, গৌরী বিয়ে করে সংসার করছে। কি সুন্দর ফুটফুটে একটি ছেলে হয়েছে তার, কি মিষ্টি আধো আধো বুলি।

প্রথম যেদিন চাকরিতে যোগ দিলাম, সেদিন এদের কাউকে চেনা তো দূরের কথা, আপিসের এই লম্বা হলখানাও চিনতাম না। গোলক-ধাঁধার মত এই বিরাট বাড়িখানা শুধু দেখেছিলাম বাইরে থেকে, ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম এ-বাড়ির অন্য এক প্রান্তে, বড়সায়েবের খাসকামরায়।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের চিঠিখানা নিয়ে কেমন একটা ভয়-ভয় থরথর বুকে এসে দাঁড়িয়েছিলাম এর সামনে, খোঁজ করে হদিস জেনেছিলাম রেকর্ড সেকশনের।

বাইরে থেকে চেহারাটা বিরাট মনে হলেও এর ভেতরে যে এমন একটা গোলকধাঁধা আছে টের পাই নি। সিঁড়ির পাশেই লিফ্‌ট ছিল, লিফটের সামনে লোকও দাঁড়িয়ে ছিল অনেক। কিন্তু সাহস করে তাদের পিছনে দাঁড়াতে পারি নি। কি জানি, এই লিফ্‌টে ওঠার অধিকার আমার আছে কিনা—আমার, রেকর্ড সেকশনে আশি টাকা বেসিক স্যালারির নতুন চাকরি-পাওয়া একটি মেয়ে-কেরানীর। তাই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙেই ওপরে উঠেছিলাম, তেতলার বারান্দায় এসে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। একে জিগ্যেস করে, ওকে জিগ্যেস করে একবার এ-বারান্দা, একবার ও-বারান্দা করেছি। আর বার বার

হাতের ছোট্ট ঘড়িটার কাঁটার দিকে তাকিয়েছি। শুধু অন্ধকার বারান্দার সারি এ দিক থেকে ওদিক থেকে এসে পরস্পরকে কাটাকাটি করে চলে গেছে, আর তারই পাশে পাশে ঘর, ঘরের সামনে টুলে-বসা চাপরাসীদের গজল্লা।

তাদেরই একজন বললে, রেকর্ড সেকশনে? আসুন আমার সঙ্গে।

বিরাট দরজা, যেমন চওড়া তেমনি উঁচু। ঢোকবার আগে বুকটা কেমন দুরু দুরু করে উঠলো, গলা শুকিয়ে এলো।

ঢুকলাম চাপরাসীর পিছনে পিছনে। ভালো করে তাকিয়ে দেখতেও কেমন অস্বস্তি। সারি সারি টেবিল, টেবিলে টেবিলে ফাইলের রাশি, দেয়ালগুলো র‍্যাক আর আলমারিতে ঠাসাঠাসি, র‍্যাকে ধুলোটে ফাইলের স্তূপ। কিন্তু বিতৃষ্ণা জাগলো না। নতুন চাকরির মোহ আর ছোট সায়েবের সঙ্গে দেখা করার আতঙ্কে তখন মন ভরে আছে।

ছোটসায়েবের সঙ্গে ইংরাজীতে কথা বলতে হবে, না বাংলায়, তা ভেবেছি দুদিন ধরে, কিন্তু কোন কিছুই ঠিক করতে পারি নি। বাবা বলেছিলেন, ইংরেজী ; ছোটমামা বলেছিল, বাংলা।

একটা কিছু ঠিক করার আগেই দেখলাম চাপরাসীটা সুইং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এসে বলছে, আসুন।

এক মুখ হেসে দুহাত তুলে নমস্কার জানালেন ছোটসায়েব, আমিও বেঁচে গেলাম।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্টের চিঠিখানা আমার কাছ থেকে নিয়েই তিনি উঠে এলেন, এসে আলাপ করিয়ে দিলেন হেড অব সেকশনের সঙ্গে।

আর সদানন্দবাবু চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

প্রথম দিনটা যে কী অস্বস্তিতে কেটেছিল! সদানন্দবাবু না থাকলে দ্বিতীয় দিন হয়তো আপিসে আসতে পারতাম না।

ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবি, চোখের চশমার ফ্রেমটা একসময় রোল্ডগোল্ড ছিল কিন্তু এখন পিতল মনে হয়, চুলের অর্ধেক সাদা। পান খান মিনিটে মিনিটে। এই হলো সদানন্দবাবু।

খুব আন্তরিকভাবে কথাবার্তা বললেন তিনি, কথা বলতে বলতে আনমনে হাতের উল্টো পিঠটা নিজের চিবুকে-গালে ঘষে নিলেন একবার, বোধহয় দাড়িটা কামানো নেই দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। এতক্ষণে ভয় কেটে গেল কিছুটা, মনে মনে কৌতুক বোধ করলাম।

সারাটা দিন কোন কাজ করতে দিলেন না সদানন্দবাবু। বললেন, এখন দিনকয়েক জিরিয়ে নিন মিস রায়, কাজ শুরু হলে আর নিশ্বাস ফেলতে পাবেন না।

আমি শুধু হাসলাম।

রেণুকাদি, অপর্ণা, সুজাতা আর গৌরীও সেদিন থেকেই কাজে লাগলো। শুধু নামধাম জিগ্যেস করা ছাড়া তাদের সঙ্গে আর কোন আলাপই হলো না। অন্য পুরুষ-কেরানীদের নামধামটুকুও জিগ্যেস করতে পারলাম না। তা কেন, মুখ তুলে তাদের দিকে তাকাতেও লজ্জা হচ্ছিল।

অথচ গৌরী ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই দিব্যি আলাপ জমিয়ে ফেললো কয়েকজনের সঙ্গে। আর তারাও গৌরীর দিকেই নজর দিলো বেশী।

দোষ নেই, আমাদের পাঁচজনের মধ্যে গৌরী একটু পৃথক। চেহারাটা ভালো, মুখখানা মিষ্টি, যেমন ফিগার তেমনি স্মার্ট। আবার তেমনি সাজপোশাক।

পরের দিনও ঠিক সময়েই এলাম, দেরাজ খুলে পেপার-ওয়েট, পিনকুশন, কলম পেন্সিল বের করে সাজিয়ে রাখলাম টেবিলে। জলতেষ্টা পেয়েছিল, সবাই চাপরাসী রাধানাথকে জল দিতে বলছিলো, কিন্তু তাদের মত আমি রাধানাথকে চেঁচিয়ে ডাকতে পারলাম না।

ফিসফিস করে সদানন্দবাবুকে বললাম, একটু জল দিতে বলুন না।

একটু আগেই রাধানাথ তাঁর টেবিলে এক গ্লাস জল কাগজের চাকতি ঢাকা দিয়ে রেখে গিয়েছিলো, সদানন্দবাবু সেটাই এগিয়ে দিলেন।

জলটা ঢকঢক করে গিলে নিয়ে বললাম, কাজ দিন।

সদানন্দবাবু হাসলেন, তারপর কয়েকটা ফাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, কাজ করতে হবে না, এগুলো উল্টে উল্টে দেখুন শুধু।

প্রৌঢ় সদানন্দবাবুর ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। অথচ এই সদানন্দবাবুই নাকি সেকশনে মেয়েদের চাকরি দেওয়া হবে শুনে রীতিমত চটে গিয়েছিলেন।

একটু একটু করে কাজ দিতে শুরু করলেন সদানন্দবাবু, সে-সব খুবই সহজ কাজ। একটু একটু করে সকলের সঙ্গে আলাপ হতেও শুরু হলো।

আলাপ হলেও বেশী কথাবার্তা ওই সদানন্দবাবু, আর চক্কোত্তির সঙ্গেই হতো। চক্কোত্তি রসিক বৃদ্ধ, শুনেছিলাম মাসকয়েক পরেই নাকি রিটায়ার করবেন।

হাসতে হাসতে একদিন বলেছিলেন, সেই এলে মা-লক্ষ্মীরা, দু'দিন আগে এলে না!

আমরা হাসতাম, আমি, অপর্ণা, রেণুকাদি, সুজাতা। আর গৌরী, যেমন প্রশ্ন, তার তেমনি জবাব দিতো।

অমন ফাজিল মেয়ে আমাদের সেকশনে আর একটিও ছিলো না। আমাদের মেয়েদের দলটাকে সব সময়ে যেন ফূর্তিতে মজিয়ে রাখতো সে।

টিফিনের সময় আমরা পাঁচজনে কাছের একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসতাম। ইটলি, দোষা, চা-কফি খেতাম, আর হৈ-হল্লা করতাম নিজেদের মধ্যেই এক একজনকে নিয়ে। পরস্পরকে আমরা এত ভালোবেসে ফেলেছিলাম যে, একদিন একসঙ্গে এই চায়ের দোকানে

এসে জুটতে না পারলে মনে হতো সারা দিনটা বুঝি বৃথাই গেলো। আবার পরস্পরের সমালোচনাও করতাম, হাসিঠাট্টা।

ছোটসায়েব যে গৌরীকে একটু স্নেহের চোখে দেখতেন, একটু ঘন ঘন তার ডাক পড়তো তাঁর খাস কামরায়, তা আমরা সবাই লক্ষ্য করতাম। সবই লক্ষ্য করতাম আমরা, কোন কিছুই আমাদের চোখ এড়িয়ে যেতো না।

রেণুকাদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল চাকরিতে ঢোকার আগেই, স্বামী স্ত্রী দু'জনেই চাকরি করতেন দু' আপিসে। আর সেই সূত্রেই কিছু কিছু খবর এসে পৌঁছাতো। রেণুকাদিই খবর এনেছিলেন ছোট-সায়েব বিবাহিত, ছেলেমেয়েও তাঁর সিকি ডজন।

মাদ্রাজী চায়ের দোকানে বসেই সে-খবর জানিয়েছিলেন রেণুকাদি, গৌরীকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, সতীন নিয়ে ঘর করতে চাস তো আমাদের কোন আপত্তি নেই।

গৌরী সশব্দে হেসে উঠে বলেছিলো, সতীনে আপত্তি ছিলো না রেণুকাদি, কিন্তু সোয়া তিনটে ছেলেমেয়েও আছে যে ছোটসায়েবের।

অপর্ণা টিপ্পনি কাটতো, যত দোষ আমাদের গৌরীর, এদিকে সন্ধ্যা যে সদানন্দ বুড়োর সঙ্গে······

আমি চটে যেতাম। আর আমি যত চটতাম ওরা তত আমাকে নিয়ে পড়তো। আমার চটার কারণ যে না ছিলো তা নয়। অভিলাষবাবু তো প্রায়ই আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন, গল্পগুজব করতেন। বেশ বুঝতে পারতাম আমার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ খুঁজছেন। আমি এড়িয়ে চলতাম। তা হোক, ওরা তো অভিলাষবাবুর নাম করে আমাকে ঠাট্টা করতে পারতো। তা নয়, বুড়ো সদানন্দবাবুকে নিয়ে।

সদানন্দবাবু লোক ভালো ছিলেন। বাড়ির খবর নিতেন। ভাইয়ের অসুখ সেরেছে কিনা। দিদির কি হয়েছে, ছেলে না মেয়ে। সত্যিকারের ভদ্রলোক ছিলেন সদানন্দবাবু, তাঁর ব্যবহারে কোনোদিন

ত্রুটি পাই নি। কিন্তু ওরা ঠাট্টা করতো বলেই আমি এক একদিন সদানন্দবাবুর ওপর চটে যেতাম, কথাবার্তা বেশী বলতাম না, হ্যাঁ-না দিয়ে উত্তর সারতাম। আর সদানন্দবাবুর ওপর চটতাম বলেই অভিলাষবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতাম।

অভিলাষবাবুর বয়স তখন কমই, চেহারাটাও মন্দ ছিলো না। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সত্যিই কোন দুর্বলতা ছিলো না আমার মনে। তবু তাঁর সঙ্গে যেচে গল্প করে আসতাম। নিজের থেকেই দু'একদিন বলতাম, চলুন, চা খেয়ে আসি।

রেণুকাদিদের সামনে দিয়েই আমরা দুজনে গিয়ে বসতাম চায়ের দোকানে। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিতাম, আরো ধীরে ধীরে কথা বলতাম। ইচ্ছে করে এমন একটা ভাব দেখাতাম, যেন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছি।

কাজ হলো কিছুদিনের মধ্যেই। ওরা সদানন্দবাবুর বদলে অভিলাষবাবুকে জড়িয়ে আমার নামে কানাঘুষো শুরু করলো। আর রেণুকাদি একদিন বললে, গেঁথে তো এনেছিস, এবার টেনে তোল।

প্রথমটা আমি খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে একটু ভয়ও যে না পেতাম তা নয়। অভিলাষবাবুর ওপর আমার কোন দুর্বলতাই ছিলো না। যেমন রেণুকাদিকে ভালো লাগতো, তেমনি অভিলাষবাবুকেও। বন্ধু ভাবতাম, সঙ্গ ভালো লাগতো তাঁর। কারণ অভিলাষবাবু মানুষটি খুব হাসিখুশী মিশুকে। এক কথায় মজার মানুষ, হাসাতে পারতেন প্রচুর, হাসতেনও।

কিন্তু এক একসময় তাঁর কথাগুলো দুমুখো মনে হতো, চোখের দৃষ্টিও। আশঙ্কা হতো, অভিলাষবাবু না ভুল বোঝেন। আমার এই অন্তরঙ্গ হবার প্রয়াসের মধ্যে তিনি ভুল করে না অন্য অর্থ খুঁজে পান।

তাই মাঝে মাঝে কৌতুকের স্বরে দু'একটা রূঢ় কথা শুনিয়ে

দিতাম, আঘাত দেবার জন্যেই। বলতাম, যে রেট-এ টাক পড়ছে আপনার, তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলুন, এরপর আর মেয়ে পাবেন না।

অভিলাষবাবুও রসিকতা করতে ছাড়তেন না। বলতেন, মেয়ের অভাব হবে না বাংলাদেশে, কিন্তু দুঃখ আমার আপনার জন্যেই।

—কেন ?

—বিয়ে হচ্ছে না, কিন্তু চুল পাকছে বলে।

চুলে আমার তখনও পাক ধরে নি, তবু বয়স যে বাড়ছে এই সত্যি কথাটা শুনতে ভালো লাগতো না। তাই হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করে বলতাম, দিন্ না আপনিই একটা ব্যবস্থা করে।

—কত মাইনে চান পাত্রের ? অভিলাষবাবু জিগ্যেস করলেন একদিন।

বললাম, অন্তত চারশো।

বললাম অভিলাষবাবুকে আঘাত দেবার জন্যেই। কারণ তিনি তখন মাত্র দেড়শো টাকা মাইনে পান।

অভিলাষবাবু দমলেন না। বললেন, দেখি তা হলে বুড়ো সদানন্দ-বাবুকে বলে, উনি পান চারশো বাহান্ন টাকা।

চটে গিয়ে বললাম, দায় পড়েছে।

অভিলাষবাবু হেসে বললেন, তা হলে অপেক্ষা করুন, সদানন্দবাবুর বয়েস হোক্ আমার, তখন আমিই চারশো টাকা মাইনে পাবো।

এ-কথা শুনে আমি আর রাগতে পারলাম না। হো হো করে হেসে উঠলাম। মনটাও হাল্কা হলো। ভাবলাম, অভিলাষবাবুর মনে নিশ্চয়ই কোন গোপন অভিলাষ নেই। থাকলে, এভাবে রঙ্গ-রসিকতা করতে পারতেন না।

এমনিভাবেই দিন কাটছিলো। একটু একটু করে কখন যে আমার মনের জড়তা কেটে গেছে, সপ্রতিভ হয়ে উঠেছি, আলাপ

হয়ে গেছে সেকশনের সকলের সঙ্গেই, রায়-হাজরা-বিনয় মল্লিকদের সঙ্গেও, তা টের পাই নি। এমন কি, এটুকুও বুঝতে পারি নি কখন থেকে কাজের চাপ বেড়েছে। ফাইলের পর ফাইল স্তূপীকৃত হয়েছে টেবিলে, দশটা পাঁচটা ঘাড় গুঁজে কাজ করতে করতে হঠাৎ কখন থেকে ফাঁকি দিতে শিখেছি, ফাঁকি-দেওয়া অকাজের সময়টুকুতে আর পাঁচজনের মতই দল বেঁধে পরচর্চা শুরু করেছি, ছোটসায়েবের উদ্দেশে গালাগালি দিয়েছি নিজেদের মধ্যে, পরস্পর বলা-কওয়া করেছি, বুড়ো সদানন্দটা রিয়াটার করে না কেন?

আমি যে একটা সাধারণ মেয়ে, আমরা, পাঁচজনই তা যেন ভুলে গিয়েছিলাম। পুরুষ-কেরানীদের সঙ্গে আমাদের যে কোন পার্থক্য আছে বুঝতেই পারতাম না।

সচেতন হতাম শুধু মাদ্রাজীদের চায়ের দোকানে যেদিন আমরা পাঁচজন একসঙ্গে জুটতাম। জুটতাম অবশ্য খুব কম দিনই। কারণ, আমি যেমন প্রায়ই অভিলাষবাবুর সঙ্গে চা খেতে যেতাম, তেমনি গৌরী, অপর্ণা, রেণুকাদি সবাই কে কোথায় যেন ছিটকে যেতো টিফিনের সময়। যেমন ছুটির পর বাস-স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াতে চাইতাম না একসঙ্গে। কেউ কেউ হয়তো ভাবতো, এক বাসে উঠলে একসঙ্গে টিকিট কাটতে হবে বলে--কিন্তু আসলে তা নয়। আমরা পাঁচজনে কেউ কাউকে সহ্য করতে পারতাম না। কিন্তু ঘূণাক্ষরে সে-কথা কেউ কাউকে জানতেও দিতাম না। দিতাম না বলেই মাঝে মাঝে একসঙ্গে এসে বসতাম।

সেদিনও এসে বসেছিলাম। কিন্তু এমন একটা খবর যে শুনবো আশঙ্কা করি নি।

আমরা চারজন এসে সবে কফির অর্ডার দিয়েছি, রেণুকাদি এসে ঢুকলেন হাসতে হাসতে। বললেন, শুনেছিস খবর?

—কি খবর রেণুকাদি?

আমরা সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।

রেণুকাদি হেসে আড়চোখে তাকালেন গৌরীর মুখের দিকে, আর গৌরীর মুখখানা কেমন অপ্রতিভ অথচ খুশী খুশী দেখালো।

রেণুকাদি বললেন, গৌরীর বিয়ে।

—কবে ?

—কোথায় ?

—কার সঙ্গে ?

সকলেই বিস্ময়ের সুরে প্রশ্ন করলাম একসঙ্গে, আর রেণুকাদি বললেন, এতদিন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছিল। বলে নি কিছুই।

একে একে সব খবর রেণুকাদির কাছেই শুনলাম। চোখের ডাক্তার, চমৎকার চেহারা, মাসে সাত আটশো টাকা রোজগার। না, প্রেম নয়, গৌরী গিয়েছিলো চোখ দেখাতে। ভদ্রলোকের দেখে ভালো লেগে গিয়েছিল। নিজেই প্রোপোজ করেছিলেন গৌরীর বাবার কাছে, পরিচিত এক ভদ্রলোকের মারফত।

আমরা সেদিন খুব হৈ-হল্লা করলাম, মশাল্লা-দোষা-আলুভাজি-কফির বিল মেটাতে বাধ্য করলাম গৌরীকে, নানারকম ফুর্তি-ফাজলামির প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললাম তাকে, আর রাগাবার জন্যে বললাম, কারও বাড়ি থেকে মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে গিয়ে বিয়ের দিন গৌরীকে উপহার দিয়ে আসবো।

গৌরী রেগে লাল হলো, হাসলো, আমাকে জড়িয়ে ধরে বললে, আমাকে কেন ভাই, ডাক্তার সেনকে।

রেণুকাদি চোখ পাকালেন ?—ডাক্তার সেন কে রে ? 'ওঁকে' বল্।

এমনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রঙ্গ-রসিকতায় দিনটা কেটে গেলো। ছুটি হলো। একে একে সকলে এসে বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়ালাম।

তারপর হঠাৎ এক সময় মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেলো। কবিতায় যাকে উদাস হওয়া বলে, ঠিক তেমনি। এতদিন পরে যেন আচমকা

মনে হলো আমি রেকর্ড সেকশনের একশো ছ'টাকা বেসিক-স্যালারীর একটি কেরানী মাত্র নই, আমি একটি মেয়ে। হ্যাঁ, এ ক'-বছরে মাইনে বেড়ে বেড়ে একশো ছ'টাকা হয়েছিলো, আর কানের পাশে দু'দশ খি চুলও পেকেছিলো। পাকা চুলগুলো রাখি নি, তুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু মন থেকে তুলতে পারি নি

তাই বোধ হয় হঠাৎ খাঁ খাঁ করে উঠলো সারা মন। গৌরী জিতে বেরিয়ে গেলো বলে নয়, আমি হেরে যাবো, হেরে গেছি এই ভয়েও নয়। মনে হলো, অভিলাষবাবুকে আমি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলাম, আমি তাকে ভালোবাসি ভেবে সে হয়তো ভুল করতে পারে এই ভয়ে তটস্থ ছিলাম এতদিন। ভাবলাম, সে ভয়টা সত্যিই মিথ্যে হয়ে যাক তা হয়তো চাই নি। অভিলাষবাবু ভুল করলে হয়তো ভালোই হতো।

কেন জানি না, অভিলাষবাবুর ওপর মনটা বিষিয়ে গেলো। বিরক্ত হলাম। বিরক্ত হলাম বাড়ির ওপর, মা-বাবা-ভাই-বোন সকলের ওপর।

যখন প্রথম কলেজে ঢুকতে চেয়েছিলাম, মা আপত্তি করেছিলো। দু'দিন রাগারাগি করে তবে সম্মতি আদায় করেছিলাম। কিন্তু পড়াশুনো শেষ করে যখন চাকরি করতে চাইলাম, বাবাও আপত্তি তুললেন। কয়েকটা বছর উঠে পড়ে লাগলেন, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। পারলেন না। সে-সময় আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে থাকতো, কারো সঙ্গে ভালোভাবে কথা বলতে পারতাম না, হাসতে পারতাম না প্রাণ খুলে। আত্মীয়স্বজনরা এসে সমবেদনার ভঙ্গিতে আমার বিয়ের কথা জিগ্যেস করতো, আমি জ্বলে উঠতাম ভেতরে ভেতরে। সারাটা দিন সারাটা রাত্রি কিভাবে যে কাটতো, মনে হতো ঘড়ির কাঁটা যেন থেমে গেছে—ক্যালেণ্ডারের পাতা নেই।

কাউকে কিছু না জানিয়েই চাকরির জন্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম,

ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। আর অ্যাপয়েন্টমেন্টের চিঠিটা পেয়ে বাবাকে দেখালাম।

বাবা দেখলেন, খুশী হলেন, বললেন, বেশ তো, চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এ অনেক ভালো।

মা বললে, আজকাল তো অনেকেই চাকরি করছে।

কি আশ্চর্য, চার বছর আগের সেই আপত্তি কোথায় উবে গেছে, কখন থেকে, তা আমি নিজেও টের পাই নি।

আর টের পাই নি, বছরের পর বছর চাকরি করতে করতে কখন থেকে বাড়িতে আমাকে কেউ আর 'মেয়ে' ভাবে না। আপিসের হেড-অব-সেকশন সদানন্দবাবুর মত, ছোটসায়েবের মত, বাড়িতেও আমি শুধু কেরানী। আত্মীয়স্বজনরাও বেড়াতে এসে কোনদিন বিয়ের কথা তুলতো না। তুলতো না বলেই আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার মনের ভেতরেও একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা আছে।

পরের দিন আপিসে এসে অপর্ণা আর সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দু'জনই যেন অসুখে ভুগছে, মুষড়ে পড়েছে, কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব। আয়নায় মুখ দেখে বুঝতে পারি নি, ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নিজের মুখটাও যেন দেখতে পেলাম।

কাজে মন বসলো না। অকারণে সদানন্দবাবুর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলাম। ধমক দিলাম চাপরাসী রাধানাথকে। আর প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অভিলাষবাবুর কাছ থেকে ফাইলটা চেয়ে নিতে পারলাম না।

তারপর টিফিনের সময় চমকে উঠলাম অভিলাষবাবুকে পিছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। সে যে কি অস্বস্তি!

—চলুন একটু চা খেয়ে আসি। অভিলাষবাবু বললেন।

আমি আরো অস্বস্তি বোধ করলাম। বোধ হয় বিদ্রোহ।

বললাম, আপনি আজ একাই যান, আমি রেণুকাদির সঙ্গে যাবো।

অভিলাষবাবু সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, আজ আমার একটু জরুরী কথা ছিলো।

কেমন অসহায় হয়ে পড়লাম আমি। যেন কিছুই বুঝতে পারছি না। উনি কি কিছু বলতে চান আমাকে? যা শুনতে চাই? না না, তা নয়, ও আশঙ্কা মিথ্যা। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে স্পষ্ট কথার চাবুক মেরে আমি নিজেই তো বোবা করে দিয়েছি অভিলাষ-বাবুকে। কিংবা সে কল্পনাটুকুও মিথ্যা। হয়তো আমার অহংকার। নিজেকে বড়ো বেশী বড়ো করে দেখেছি। অভিলাষবাবু এই নীরস মধ্যাহ্নের মুহূর্ত-কয়েকের বিশ্রাম চেয়েছেন, সঙ্গ চেয়েছেন, সঙ্গী করতে চান নি।

তাই ধীরে ধীরে বললাম, চলুন।

অন্য দিনের মতোই এসে বসলাম চায়ের দোকানের খোপটায়।

দু'পেয়ালা কফির অর্ডার দিলেন অভিলাষবাবু। কফি দিয়ে গেলো। চামচটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কফির পাত্রে নাড়তে লাগলেন অভিলাষবাবু। অনেকটা সময় কেটে গেলো। দু'জনেই চুপচাপ।

তারপর এক সময় বেশ চেষ্টা করেই সোডার বোতলের ছিপি খোলার মত আকস্মিক সশব্দতায় অভিলাষবাবু প্রশ্ন করলেন, আপিসের এই চাকরি আপনার ভালো লাগে?

স্পষ্টভাবে সত্যি কথাটাই বললাম।—না।

অভিলাষবাবুর গলার স্বর গাঢ় হয়ে এলো।—এসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছে হয় না আপনার?

খিল খিল করে হেসে উঠলাম। কথাটাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলাম, বললাম, হলেই বা উপায় কি?

অভিলাষবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধীরে ধীরে চামচটা ঠুনঠুন

করে কফির পাত্রে বাজাতে বাজাতে মুখ নিচু করেই বললেন, আমি বলছিলাম কি, আপনার অমত যদি না থাকে······

অস্বস্তিতে, লজ্জায়, অপ্রতিভতায় আমি কেন জানি না, তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে দাঁড়ালাম। আমি কেমন যেন অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম।

অভিলাষবাবুও উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, আজকেই উত্তর দিতে বলছি না, আজকের দিনটা ভেবে দেখুন, কাল, কাল ঠিক এই সময়ে আপনার উত্তরটা শুনবো।

কোন জবাব দিতে পারলাম না। সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। বুক ঢুরুঢুরু করছে, কেমন একটা আতঙ্ক আর আনন্দের ভাব, ঠিক সেই চৌদ্দ বছর বয়সে পাড়ার একটা বকাটে ছেলে যেদিন পাশ দিয়ে যাবার সময় হাতে চিঠি গুঁজে দিয়েছিলো, ঠিক সেই দিনের মত কাঁপতে কাঁপতে সেকশনে ফিরে এলাম। একটিমাত্র প্রশ্নে আমার বয়সটা যেন কুড়ি বছর পিছনে চলে গেলো, মনে হলো সেদিনের মতই অনভিজ্ঞ এক কিশোরীতে পরিণত হয়ে গেছি।

সেদিন আর কোন কাজে মন বসলো না। চোখ তুলে বুড়ো সদানন্দবাবুর দিকেও তাকাতে পারলাম না। প্রশ্ন নয়, কথা নয়, অভিলাষবাবু যেন এক মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছেন আমার মুখে। মুখ তুললেই যেন সকলে দেখতে পাবে।

ছুটির পর সকলকে এড়িয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালাম। প্রথম বাসটার ভিড় ঠেলেই উঠে পড়লাম কোনদিকে না তাকিয়ে।

সমস্ত রাত্রি ঘুম এলো না। না, আনন্দ নয়, কেমন একটা ভয় ভয় ভাব। কেমন একটা আতঙ্ক।

ঘর-সংসারের কথা ভেবেছি, গৌরীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা বোধ করেছি। এই ধুলোটে ফাইলের পরিবেশ আর চাকরি-জীবনের তিক্ততা থেকে রেহাই চেয়েছি কতদিন।

কিন্তু সেই ঘর-সংসার বিবাহিত জীবন সামনে এসে দাঁড়াতেই কেন যে ভয় পেলাম নিজেও বুঝতে পারি না। কেমন একটা অবোধ্য আতঙ্ক। কিন্তু কি উত্তর দেবো অভিলাষবাবুকে। জীবনের একমাত্র কামনা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সামনে এসে। হাত বাড়াবো, না, হাত গুটিয়ে নেবো ?

কোন উত্তরটাই যেন মনের মতো হয় না।

ভাবতে ভাবতে একটা রাত কেটে গেলো। সকাল।

ভাবতে ভাবতেই কখন আপিসে পৌঁছে গেছি। নিজের টেবিলে এসে বসেছি, দেরাজ খুলে পেপার-ওয়েট, পিন-কুশন, কলম-পেন্সিল বের করে সাজিয়ে রেখেছি, রাধানাথকে চেঁচিয়ে ডেকেছি, বলেছি জল দিতে, তারপর ঢক ঢক করে জলটুকু খেয়ে তলানিটুকু ঢেলে দিয়েছি শুকিয়ে-যাওয়া কালির দোয়াতে।

মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, কি উত্তর দেবো। ঠিক করে ফেলেছি, উত্তর নয়, কপট লজ্জা আর মৃদু হাসি হেসে সম্মতি জানাবো।

খুব অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেছেন সদানন্দবাবু, তাঁর বাড়ির কথা, আমার বাড়ির কথা। বলেছেন, ছোটসায়েব লোক তো ভালো ছিলেন, এখন মেজাজটা কড়া হয়ে গেছে। বলেছেন, আমার তো আর মাত্র দু'মাস মিস রয়! তারপর রেণুকাদি এসে বসেছেন এক সময়, চেয়ার টেনে নিয়ে অপর্ণা আর সুজাতাও।

রেণুকাদি বলেছেন, সুজাতা চললো।

—কোথায় ?

অপর্ণা হেসে বলেছে, এ জি বি। ভাল চাকরি পেয়েছে।

রেণুকাদি বলেছেন, তুই এবার ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দিয়ে দে সন্ধ্যা। তা না হলে উন্নতি হবে না।

আমি চুপ করে শুধু শুনেছি। শুনে গেছি, সুবিমলবাবু চিৎকার করে মানিককে বলছেন, তিনি নাকি ডব্লু বি সি এস দিচ্ছেন। রায়

আর হাজরার থিয়েটারের গল্পঃ ভেবেছিলাম গৌরী দেবীকে পার্টটা করতে বলবো, আপনি একটা রোল করুন না মিস রায় ?

আমি হেসেছি শুধু। কতদিন এই ছোটসায়েবের চরিত্রচর্চায় মজে গিয়েছি, ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি। মেন রোলটা গৌরীকে কেন দেয়া হবে বলে তর্ক করেছি।

কিন্তু অভিলাষবাবুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যেন শান্তি নেই।

একসময় সময় কেটে গেছে। একে একে টিফিনে বের হতে শুরু করেছে সকলে। আর আমি অভিলাষবাবুর দিকে তাকিয়েছে, অভিলাষবাবু আমার দিকে।

দু'জনে চুপচাপ এসে বসেছি চায়ের দোকানটায়। দু'পেয়ালা কফির অর্ডার দিয়েছি আমি নিজেই। তারপর কফির পেয়ালায় চামচ নেড়েছি ঠুনঠুন করে, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেছি, তারপর এক সময় হঠাৎ বলে উঠেছি, তা হয় না অভিলাষবাবু। তা হয় না। একথা আমি কোনদিন ভাবি নি, আমরা বন্ধু, আমরা···

আবেগে থর থর করে উঠেছি আমি। কথা শেষ করতে পারি নি।

ধীরে ধীরে কফির পেয়ালাটা আমি শেষ করেছি, আর অভিলাষ-বাবু পেয়ালাটায় একটা চুমুকও দেন নি। সেটা আমার চোখের সামনেই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

তারপর ধীরে ধীরে উঠে এসেছি, এসে বসেছি নিজের টেবিলে। এক মনে, হাল্কা মনে কাজ করেছি তন্ময় হয়ে। ভারী পাথরটা তখন সরে গেছে বুক থেকে।

ধুলোটে ফাইলগুলোকে ভেলভেটের ব্লাউজের চেয়েও নরম মনে হয়েছে। সদানন্দবাবুর গিন্নীর গল্প শুনতে আগ্রহ বোধ করেছি, সুবিমলবাবুকে বলেছি, গত বছরের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো দেবেন তো

একবার ; রায় আর হাজরাকে বলেছি, মেন রোল, আমাকে দিতে হবে, রেণুকাদিকে ঠাট্টা করেছি তাঁর স্বামীর কথা বলে, অপর্ণাকে খোঁটা দিয়ে বলেছি, লজ্জাও করে না, এখনও পাত্রপক্ষের সামনে সেজে গুজে গিয়ে বসতে।

তারপর এক সময় নিজের মনকেই প্রশ্ন করেছি, ঘর-সংসারকে আমি ভয় পাই, না, এই রেকর্ড সেকশনের ধুলোটে ফাইল আর ধোঁয়াটে মানুষগুলোকে ভালোবাসি ?

উত্তর খুঁজে পাই নি। উত্তর খুঁজে খুঁজেই বছরের পর বছর কেটে গেছে, কেটে চলেছে। কিন্তু সেদিন গৌরীর ফুটফুটে ছেলেটাকে দেখে এত ভালো লাগলো, এমন মিষ্টি মুখখানা, একুশ বছরের বাচ্চা ছেলে মানিক যেদিন আপিসে জয়েন করলো, সেদিন যেমন ভালো লেগেছিল, ঠিক তেমনি······

ঝিনুকের কৌটো

বিয়ের পর চার বছর নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পায় নি শান্তনু। অথচ এই সময়টুকুই তো মানুষের জীবনে একমাত্র অবসর। কেমন একটা মুগ্ধ আত্মহারা ভাব মনের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে থাকে এই সময়ে। দায়দায়িত্ব, অর্থচিন্তা, আত্মীয়স্বজন সবকিছুই মন থেকে মুছে যায়। চোখে কেমন একটা রঙিন দৃষ্টি আসে, শরীরে ঝলমলিয়ে ওঠে পরিতৃপ্তির আলো।

শান্তনু বিয়ের পর যে এমন দিন উপভোগ করে নি তা নয়, কিন্তু সে শুধু কটা দিনের জন্যে, বড় জোর কয়েকটা মাস। তারপর বারংবার কঠোর বাস্তবের আঘাতে সেই মুগ্ধভাব তার কেটে গেছে, নিজেকে বাঁধতে বাধ্য হয়েছে দৈনন্দিন কাজ আর কর্তব্যের জোয়ালে।

সেই একঘেয়ে জীবনের অন্ধকার কারাকক্ষে এক ফালি আলো শুধু দেখা দিয়েছিলো একবার, যেদিন রুমার জন্ম হলো। যে কোথাও ছিলো না সে এলো। চাপা নাক, তুলতুলে একটা শরীর, কী সুন্দর গাঢ় নীল ধূর্ত একজোড়া চোখ, সরু সরু আঙুল।

শান্তনু আর গীতা দু'জনেই আবার একবার মুগ্ধ হলো, আত্মহারা হলো। মেয়েকে চুমু খেয়ে, আদর করে, তার ননীর মত কোমল দুটি হাতে থাসাথাসি করে সে যে কী আনন্দ!

দুটো একটা করে ভাঙা ভাঙা কথা ফুটতে শুরু হলো যখন, তখন আরো আনন্দ। এক একটা নতুন কথা শিখতো রুমা, আর রুমার বুদ্ধি দেখে তাজ্জব হয়ে যেতো শান্তনু। এই একফোঁটা মেয়ে, সেদিনও যে ছিলো না, সে এত কথা শিখছে কি করে? বিস্মিত হতো শান্তনু আর গীতা, আবার কথা শুনে হেসে লুটোপুটিও খেতো। কখনো

ভাবতো, এই বয়সে এত বুদ্ধি কি করে হয়, এত ধূর্তমি শেখে কি করে!

আপিসে যেতে ইচ্ছে হতো না শান্তনুর, মনে হতো মেয়েকে নিয়ে সারাদিন শুয়ে বসে আদর করে কাটিয়ে দেয়। আপিস থেকে ফিরতে চাইতো তাড়াতাড়ি, কিছুটা দুশ্চিন্তায়—কেমন আছে রুমা, বিপদ আপদ ঘটে নি তো ইতিমধ্যে, আবার কিছুটা উদ্দাম আগ্রহে, গিয়ে দেখবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রুমা, দেখতে পেয়েই, 'বাবা এয়েছে, মা বাবা এয়েছে,' বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে নিচে আসবে এই লোভে।

তবু তারই মধ্যে কেমন করে যেন একঘেয়েমি ঢুকে গেলো। হয়তো কাজের চাপে, হয়তো শরীরটা ভালো যাচ্ছিলো না বলে। মনে মনে তাই একটা গোপন ইচ্ছা রেখেছিলো শান্তনু। একদিন কথাটা ভেঙেই ফেললে গীতার কাছে।

বললে, চলো, দিনকয়েক কোথাও বেড়িয়ে আসি।

—কোথায়? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো গীতা। বিস্ময় তার অকারণ নয়, যেখানে প্রতি মাসের শেষেই আয়-ব্যয়ের হিসেবে জোড়া লাগাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সে, সেখানে বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কল্পনা মাথায় আসে কি করে শান্তনুর। চেঞ্জে যাওয়া, দেশভ্রমণে যাওয়া—এমন সব কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু সে সব উঁচুমহলের লোকদের জন্যে। গীতা আর শান্তনু যাবে বেড়াতে? তবু কথাটা শুনে গীতার মনেও যে একটু লোভ উঁকি না দিয়েছে এমন নয়।

—টাকার অভাব তো চিরকালই থাকবে, চলো ধার করেই নয় দু'দশদিন পুরী থেকে ঘুরে আসি।

শান্তনু যখন এ-কথা বলেছে তখন গীতা সায় দিয়ে বসেছে। বলেছে, বেশ তো! কি আর এমন খরচ হবে। আমি সব সামলে নেবো ফিরে এসে!

শেষ অবধি তাই ছুটি নিয়েছে শান্তনু, গিয়ে উঠেছে পুরীর একটা কম-খরচের হোটেলে।

হোটেলটা দেখে, হোটেলের ঘর দেখে খুশীই হয়েছে ত্ব'জনে। বাঃ বেশ ছোট্ট ঘরখানি, একেবারে সমুদ্রের ওপরে। বারান্দায় বসে বসে সমুদ্রের অবিশ্রান্ত ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। ঢেউয়ের মাথায় মাতালের মত টলছে যে নুলিয়া-ডিঙির সারি, তার দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, আর দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের রঙ্ বদলাচ্ছে।

একঘেয়ে জীবনের রঙও যেন তাদের ক্ষণে ক্ষণে বদলাতে থাকে।

প্রথম যেদিন রিক্শায় করে হোটেলের দিকে আসছিলো গীতা, সেদিন রাস্তা থেকেই সমুদ্র দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলো সে। শান্তনু এর আগেও এসেছে এখানে, সমুদ্র দেখেছে। কিন্তু গীতা জীবনে এই প্রথম বেন সমুদ্রের স্বাদ পেলো।

কেমন একটা গুরগুর ধ্বনি, তারপরই চর্‌চর্‌চর্ ব্রেকারের শব্দ। নীল ঢেউ আর সাদা ফেনার মাতলামি। এই নাকি সমুদ্র? এত বিশাল আর সীমাহীন অথৈ জলের রাশি এই প্রথম দেখলো গীতা। বিস্ময়ের চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন নেশা ধরে যায়। সেই এক শব্দ, সেই এক ঢেউ, একই ভাবে তীরের বালিতে ভেঙে পড়া। তবু সেই একই ঢেউ নয় যেন। প্রতিবারই বুঝি সে নতুন ঢেউ, নতুন রঙ।

হোটেলের ঘরটিতে কোনরকমে বাক্স-বেডিং নামিয়ে দিয়েই রুমাকে বুকে জাপটে নিয়ে ছুটলো গীতা।

আহ্লাদের আলোয় সারা মুখ ভাসিয়ে শান্তনুর পাঞ্জাবির আস্তিন ধরে টানলে, আহা এসো না, এসো না একবারটি, পড়ে গিয়ে দেখবো একবার।

বাধ্য হয়েই শান্তনুকে সঙ্গ দিতে হয়। খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগে গীতার। একেবারে পাড়ে গিয়ে

দাঁড়াতে একটু ভয় ভয়ও করে। কি ভীষণ এক-একটা ঢেউ। একবার যদি পা ফসকে ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে যায় তবে কি ওই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে? কিন্তু ভয়ই বা কিসের, ওই তো অত লোক হাঁটছে, কয়েকটা মেয়ে, ঘোমটা-টানা একটা ফুটফুটে-মুখ বউ। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও তো বেশ ছুটে গিয়ে ভেঙে-পড়া ঢেউয়ের সাদা ফেনায় পা ভিজিয়ে আসছে। তবে আর গীতার এত ভয় কেন।

তবু ঠিক সাহস হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দেখে গীতা, রুমাকে বুক থেকে নামিয়ে দিয়ে।

রুমাও আনন্দে হাততালি দিয়ে ওঠে, ছুটে যেতে চায়, সাদা সাদা ফেনায় পা ভেজাবার জন্যে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সমুদ্র দেখে ফিরে আসে। বাক্স বিছানা যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। গোছগাছ তো করতে হবে। তা ছাড়া সারাটা রাত ট্রেনে এসেছে, এক কাপ চাও পড়ে নি পেটে।

শান্তনু তাই বললে, চলো, চা-টা খেয়ে পরে আসবে।

নিতান্ত অনিচ্ছায় ফিরে এলো গীতা। চা-ডিম-টোস্টের লোভ নেই ওর, তার চেয়ে যদি আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পেতো!

হোটেলের ঘরখানাও কিন্তু বেশ। সামনে এক টুকরো বারান্দা আছে, আর সেখান থেকেও সমুদ্র দেখা যায়, জেলেডিঙিগুলো দেখা যায়। নুলিয়ারা জাল শুকোয়, জাল মেরামত করে, মাতাল ঢেউয়ের মাথায় নৌকা ভাসাবার চেষ্টা করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কখনো বা ডেকচেয়ারে শরীর এলিয়ে দেখে গীতা।

শান্তনু এসে পাশে বসে, হাঁটু জড়িয়ে রুমা। কী সুন্দর এই পৃথিবী, জীবন, সময়। ভোরবেলায় উঠেই উনোন ধরাবার তাড়া নেই, বাসন-মাজার ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া নেই, আয়ব্যয়ের হিসেব মেলানোর দুশ্চিন্তা নেই।

এমন নিশ্চিন্ত আরাম, এত আনন্দ, এত সুখ যেন অসহ্য একটা ফুর্তির ঢেউ হয়ে ফেটে পড়তে চায় গীতার বুকের ভেতর।

—উঃ, এতদিন কোথায় ছিলাম বলো তো। অনুযোগের স্বরেই বলে গীতা। চোখ দুটো তার বড় বেশি উজ্জ্বল দেখায়।

সেই একজোড়া সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শান্তনুও যেন সব ভুলে যায়, মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে হাসে। হাসি নয়, যেন গীতার কথায় সায় দেয়। সত্যিই তো, কোথায় ছিলো সে এতদিন? একঘেয়ে জীবনের মধ্যে, দশটা-পাঁচটার ছকে বাঁধা দলাদলি অভাব-অসন্তোষের মধ্যে এতদিন নিজেকে খুঁজে পায় নি সে।

কিন্তু কতক্ষণ আর বসে থাকতে পারবে গীতা। রোদ তো অনেকক্ষণ হলো পড়ে গেছে, বালি ঠাণ্ডা হয়েছে, আবার রঙবেরঙের শাড়ির আগুন ছড়িয়ে একটার পর একটা মেয়ের দল চলেছে পাড় ঘেঁষে। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলোও ছুটছে, বালি ছুঁড়ছে, হাসছে, লুটোপুটি খাচ্ছে।

রুমাই বা কতক্ষণ লোভ সামলাবে। মা'র হাঁটু জড়িয়ে সে বরাবর নাকি সুরে আব্দার ধরে, চলো না মা, সমুদ্দুরের কাছে চলো না।

আচ্ছা, ওরা ওই কুড়োচ্ছে কি? ওই যে দুটি মেয়ে চলছে—ওরা মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ে কি তুলছে? ওমা, ঝিনুক? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সকালে দেখেছিলাম বটে, ভাঙা ভাঙা পড়েছিলো বালির ওপর। ওগুলো ঢেউয়ের সঙ্গে আসে? কি করে আসে? আমি ভেবেছিলাম কি জানো, বোধহয় নুলিয়াদের—নুলিয়াই তো, ওই কালো কালো লোকগুলো?—ভেবেছিলাম ওদের জাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে।

ছুটতে ছুটতে রুমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসে গীতা। এখন তো আর ভয় নেই ঢেউকে, শান্তনু না এলো তো বয়েই গেল। চল্ রুমু, আমরাও ঝিনুক কুড়ুই।

কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি লাগে গীতার। একদল লোক—কেউ

দাঁড়িয়ে, কেউ বসেছে মাহুর নয়তো শতরঞ্জি বিছিয়ে, গল্প করছে। খুব ফ্যাশন-করা ঢিলে-খোঁপা একটা বউ হেলেহুলে হাসছে ওদের সঙ্গে, গল্প করছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করলো গীতা। ওদের চোখের সামনে ঝিনুক কুড়োবে ও? কুড়োলেই বা, ওই তো দূরে দূরে কয়েকটা গীতার-বয়সী মেয়ে—কি আশ্চর্য, ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে এত দূর চলে গেছে? সেই বেজায় উঁচু লাইট-পোস্ট ছাড়িয়ে, রেলহোটেল ছাড়িয়ে। কি সাহস রে বাপু!

আরে, রুমাও যে ঝিনুক কুড়োচ্ছে।—মা, মা, দেখো, কী সুন্দর একটা ঝিনুক পেয়েছি!

এরই ফাঁকে কখন অন্যমনস্ক হয়েছে গীতা, আর রুমা নেমে গেছে। ঝিনুকটা নিয়েই ফুর্তিতে চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো রুমা।—দেখো দেখো, কী সুন্দর একটা ঝিনুক!

আড়চোখে একবার শতরঞ্জি-বিছিয়ে-বসা দলটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ঝিনুকটা হাতে নিলো গীতা। ছোট্ট একটা ঝিনুক, কী সুন্দর জুঁইফুলের মত সাদা!

শান্তনু এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে।

গীতা ঝিনুকটা দিলো তার হাতে। শান্তনু নিলো সেটা, হাসলো, রুমাকে ফিরিয়ে দিলো। তারপর বললে, দুর্ এতো কতই আছে, এর চেয়ে অনেক বড়ো বড়ো পাবে, কত রঙ বেরঙের, কত সুন্দর সুন্দর···

গীতা আস্তে আস্তে, একটু লাজুক স্বরে বললে, চলো না একটু ওদিকে, আমরাও কুড়োবো।

—বেশ তো।

ধীর-পায়ে একটু একটু করে এগোতে শুরু করলো ওরা। দু'পা চার পা। একটা করে ঢেউ এসে পড়ে আর ছুটে যায় গীতা। রুমাও পিছনে পিছনে।

নুয়ে পড়ে ঝিনুক কুড়োয়। হাতের রুমালটাকে ইতিমধ্যে একটা থলের মত করে নিয়েছে গীতা।

শান্তনু ধীরে ধীরে হাঁটছে, হাসছে মনে মনে, দেখছে গীতাকে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে গীতাকে! এই ছেলেমানুষ, হাসিখুশী গীতাকে কোনদিন যেন দেখেনি শান্তনু। দেখতে পায় নি।

একটা ক্যামেরা থাকলে ছবি তুলে রাখতো। গীতার এ চেহারা আগে কখনো চোখে পড়ে নি কেন তাঁর! এই উচ্ছল যৌবন। সমস্ত শরীর থেকে যৌবনের ছন্দ ঝরে পড়ছে। রঙিন ডুরে শাড়িটা টানটান করে পরেছে গীতা, কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে আঁচলটা। সুপুষ্ট সুডোল পিঠের ওপর শাড়িটা পাক খেয়ে গেছে, চিকচিক করছে ফরসা ঘাড়, ঘাড়ের ওপর সরু হারটা, নিরাবরণ হাত আর কনুইয়ের ভঙ্গিটা কী অপরূপ, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে কেমন লালচে আভা দিচ্ছে। সূর্য ডুবছে ওদিকে, নীল—নীল নয়, ধোঁয়াটে সমুদ্রের ওপর সূর্য ডুবছে। ঠিক একটা কলসী যেন উপুড় করে রেখেছে কেউ সমুদ্রের সীমান্তে। একটা লাল টকটকে কলসী—সিঁদুর-মাখানো। আর তার লাল আভার সঙ্গে রুপোলী মেঘের মাখামাখি।

—গীতা!

এতখানি হেঁটে এসে শান্তনুও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সারা শরীর ঘেমে উঠেছে। ভিজে জবজব করছে পাঞ্জাবিটা।

শান্তনু আবার ডাকলে, এই গীতা! এবার চলো, ফিরি ওদিকে। আর কত কুড়োবে!

দাঁড়াও না বাপু! জবাব দেয় গীতা। হাসতে হাসতে বলে, এই ছক-কাটা ঝিনুকটার একটা জোড়া পেলেই ফিরবো।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শান্তনু, আরো কিছুটা হেঁটে যায় স্বর্গদ্বারের দিকে। না, ফেরবার নাম নেই গীতার। রুমাও ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে চলেছে।

এবার একটু রাগত ভাব ফোটে শান্তনুর গলার স্বরে। বলে, আমি চললাম। যাও যতদূর তোমার খুশী। রুমা, রুমা তুমি ফিরে এসো।

—বেশ, বেশ। আমি যেন একা যেতে পারি না, অত কি ভয় দেখাচ্ছো মশাই, যাও না ফিরে। উত্তর দেয় গীতা। কিন্তু ঝিনুক কুড়ানোর কাজ থামে না তার।

আর রুমা যেন শুনতে পায় নি, এমন ভাব করে।

পা টনটন করে শান্তনুর, ক্লান্তিতে সারা শরীর অবসন্ন, কম হেঁটেছে নাকি সে। তবু বাধ্য হয়েই আরো দু'চার পা এগোতে হয়। আবছা অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, এই ভিড়ে ফেলে রেখে তো চলে যেতে পারে না।

আরেকবার ধমক দিয়ে সত্যিই ফিরতে শুরু করে শান্তনু।

গীতা একবার ফিরে তাকায়, নিজের মনেই হাসে, তারপর আবার ঝিনুক কুড়োনোয় মন দেয়। বাবু খুব চটেছেন বোধহয়। কি রকম দপদপ করে পা ফেলছে দেখো। বাঃ রে, সবাই তো ঝিনুক কুড়োচ্ছে। ঝিনুক না কুড়িয়ে করবই বা কি? বসে বসে সমুদ্র দেখবো?

এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো গীতা। উঃ, কোমর টনটন করছে, পিঠের শিরদাঁড়াটা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অসীম ক্লান্তিতে পা দুটো ভারী হয়ে গেছে। পা টানতে পারছে না। সকালে সেই যে পায়ে গোদ নিয়ে একটা পাণ্ডা এসেছিলো, ওর পা দুটোও যেন তেমনি ভারী হয়ে গেছে।

নাঃ, বেশি দূরে চলে যায় নি শান্তনু। ওই-তো দেখা যাচ্ছে ওর ছায়া ছায়া শরীরটা।

রাগে দপদপ করতে করতেই ফিরে আসছিলো বটে শান্তনু, তবু দু'চার-বার পিছন ফিরে তাকিয়েও ছিলো। যখন দেখলে, গীতাও

ফিরছে এক হাতে ঝিনুকের থলি নিয়ে আরেক হাতে রুমাকে টানতে টানতে, তখন আরো দ্রুত চলতে শুরু করলে শান্তনু।

যেতে যেতে এক জায়গায় দেখলো একটা ছোট্ট দল বসেছে। দুটি মেয়ে, একটি বুড়ো, বোধহয় মেয়ে-দুটির দাদু, আর তিনটি ছোকরা গোছের।

কয়েকটা চায়ের পেয়ালা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে বুড়ো, কমবয়সী মেয়েটি কেটলী থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে আদুরে স্বরে রসিকতা করছে দাদুর সঙ্গে। হাসছে সবাই।

বেশ লাগছে মেয়েটিকে। দু'বার ফিরে তাকালো শান্তনু তার দিকে। তারপর বালি মাড়িয়ে মাড়িয়ে হোটেলের সামনে এসে হোটেলের নিয়ন-আলোয় ভেজা নরম বালির ওপর বসে পড়লো। গীতা যখন আসে আসবে। কোথায় তোয়ালে বিছিয়ে পাশাপাশি বসে গল্প-গুজব করবে, ঢেউ দেখবে, আকাশ দেখবে, তা নয় তিন মাইল হেঁটে বেড়াও তার পিছনে পিছনে।

গীতার ওপর যত না রাগ হচ্ছিলো, তার চেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিলো ঝিনুকের ওপর। কি অমূল্য জিনিস, চারটে পয়সা দিলে নুলিয়াদের ছেলেগুলো একরাশ এনে হাজির করবে।

সমুদ্রের বুকের গুমগুম ধ্বনির মতই শান্তনুর বুকের ভেতরটাও যেন গুমরে উঠছিলো, রাগে, ক্ষোভে।

বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, অন্ধকার হয়ে গেছে কোন ফাঁকে, চাঁদ উঠেছে, ভাঙা চাঁদ। বসে জিরিয়ে এতক্ষণে শরীরের ক্লান্তিটা যেন জুড়িয়ে নিয়েছে শান্তনু।

ওদিকে কয়েকটা লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। উৎসুক চোখে সেদিকে তাকালো শান্তনু, কিন্তু উঠে যেতে ইচ্ছে হলো না। এদিকে গীতাও এসে পৌঁছেছে। না, একটাও কথা বলবে না শান্তনু, একটাও না। ওর যা খুশী করুক, শান্তনু শুধু চুপচাপ বসে

থাকবে। সমুদ্র দেখবে। তারপর এক সময় একা একাই হোটেলে ফিরে যাবে।

কিন্তু গীতা অমন রাগ-অভিমান অনেক দেখেছে। শান্তনু যে চটেছে, মনে মনে ফুলছে, তা জানে গীতা। কিন্তু জানতে দেবে কেন!

গীতা এসেই ধুপ করে বসে পড়লো শান্তনুর পাশে।

—আসবার সময় আহ্লাদীকে দেখলে? হাসলো গীতা।

এত যে রেগেছিলো শান্তনু, এত সব প্রতিজ্ঞা করে বসেছিলো কথা বলবে না বলে, সব রাগ জল হয়ে গেলো।

বললে, আহ্লাদী কে?

—কেন, ওই যে ন্যাকা ন্যাকা মেয়েটা, কেটলী-হাতে দাদুর সঙ্গে রসিকতা করছে।

—ওর নাম আহ্লাদী কে বললে?

হাসলো গীতা।—আমি নাম দিয়েছি।

শান্তনু ভেবেছিলো গীতার নেশাটা একদিনেই কেটে যাবে। ভুল ভেবেছিলো। পরের দিন সকাল না হতেই দেখলো কুড়োনো ঝিনুক-গুলো নিয়ে বসেছে সে। জলে ধুয়ে তার বালি পরিষ্কার করে দামী টার্কিশ তোয়ালের ওপর সেগুলো বিছিয়ে রোদে দিচ্ছে।

—একটা কৌটো কোথায় পাই বলো তো? গীতা নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করলো।

তারপর অপরূপ হিল্লোলে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা তর্জনী তুলে নিজেই বললে, ঠিক হয়েছে, রুমার গুঁড়ো-দুধের টিনটা···

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কৌটো থেকে সামান্য দু'দশ চামচ যা গুঁড়োদুধ ছিল, সেটুকু কাগজের মোড়কে ঢেলে রেখে কৌটোটা পরিষ্কার করতে শুরু করলো।

সারাটা দিন ওই এক কাজ। মা আর মেয়ে দিনরাত কেবল

ঝিনুক নিয়ে মেতে আছে। গীতার দেখাদেখি রুমাকেও যেন ওই এক নেশায় পেয়েছে। শান্তনু দেখে আর হাসে। কখনো বা বিরক্ত হয়। তবু রুমাকে নিয়ে গল্প করে, আদর করে, গায়ে বুকে তাকে আঁকড়ে ধরে হাসাহাসি করে সময় কাটছিলো শান্তনুর। সেটুকু আনন্দও যেন কেড়ে নিয়েছে ওই ঝিনুকের নেশা। রুমাকে আধখানা কেড়ে নিয়েছিলো গীতা, বাকী আধখানাও কেড়ে নিলো তার ঝিনুকের নেশা।

কী অসীম ধৈর্য গীতার! ভাবে শান্তনু। কখনো ঝিনুকের রাশি সাবান-জলে ধুয়ে রাখছে, রোদে শুকোতে দিচ্ছে, কৌটোয় ভরে রাখছে কখনো, আবার দু'মিনিট পরেই সেগুলো বের করে জোড়া মিলিয়ে দেখছে, রঙ মিলিয়ে দেখছে। 'জানো, এই ঝিনুক দুটো দিয়ে না, তোমাকে কী সুন্দর একটা ছাইদানি করে দেবো দেখো। কাপড়ের ওপর এই রঙিন ঝিনুক বসিয়ে কি চমৎকার একটা পর্দা হবে দরজার। সাদা ঝিনুকগুলো বসিয়ে একটা পয়সা-রাখার কৌটা হবে বেশ ভালো, না?' এমনি একটা না একটা কথা সারা দুপুর।

আর সকাল না হতেই রুমার হাত ধরে ছুটবে সমুদ্রের পাড়ে, বালির ওপর যেখানে ঢেউয়ের ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে, আর ঢেউয়ের সঙ্গে রাশি রাশি ঝিনুক। সন্ধ্যেবেলাও ওই একই কাজ। ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে কতদূর যে চলে যায় গীতা, শান্তনুর চোখের নাগাল থেকেই নয়, তার মনের নাগাল থেকেও।

এমনি করেই কাটছিলো দিনগুলো—গীতার উচ্ছল আনন্দ আর শান্তনুর অসীম বিরক্তিতে। কত কি ভেবে এসেছিলো শান্তনু, কত রঙিন স্বপ্ন দেখেছিলো। ভেবেছিলো, সেই যেদিন ফুলের সৌরভ আর সানাইয়ের সুরে প্রথম পরিচয়ের মোহ জেগেছিলো তার চোখে, তেমনি আনন্দের বিশ্রামে গা ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু সব স্বপ্ন বুঝি ভেঙে যেতে চলেছে।

হয়তো ভেঙেই যেতো শান্তনুর স্বপ্ন, তার আগে নেশাই ভেঙে গেলো গীতার একটা ঘটনায়।

প্রতিদিনের মতই ঢেউয়ের গায়ে পা ভিজিয়ে চলেছিলো গীতা আর রুমা। যেতে যেতে গীতা হঠাৎ দেখলে, বালির ওপর একটি ছেলে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কী সুন্দর সুন্দর সব মূর্তি আঁকছে। ঠিক যেন মন্দিরের গায়ের মূর্তির মত।

অন্যমনস্ক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো গীতা, মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো ছেলেটিকে। দেখছিলো তার আঙুলের জাদু।

আর ঠিক তখনই চিৎকার করে উঠলো রুমা। ছুটে এলো গীতা, দূর থেকে শান্তনুও ছুটে এলো। কোনরকমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে শান্তনু টেনে তুললো রুমাকে।

ধক্ করে উঠেছিলো গীতার বুক, নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো সে। অন্যমনস্ক হয়েই ঝিনুক কুড়োচ্ছিলো রুমা, আর একটা আচমকা বড় ঢেউ এসে আর একটু হলেই তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলতো সমুদ্রের দিকে।

চিৎকার শুনে আরো কয়েকজন জড়ো হলো।

আর শান্তনুর মনের রাগ হঠাৎ ফেটে পড়লো গীতার ওপর। দিনে দিনে যে রাগ পুঞ্জীভূত হচ্ছিলো, সেটা এই ঘটনায় ফেটে পড়লো অভদ্রভাবে, রূঢ়স্বরে—তোমার ওই ঝিনুকের নেশাই একদিন মেয়েটাকে খুন করবে।

আর জড়ো-হওয়া মেয়েপুরুষদের সামনে শান্তনুর ধমক খেয়ে লজ্জায় মরে গেলো গীতা। শুধু লজ্জা নয়, ক্রোধও জমে উঠলো তার বুকে। শান্তনুর প্রতিটি কথা যেন সেই গল্পে-শোনা বিষাক্ত সামুদ্রিক মাছটার লেজের ঝাপট।

একটাও কথা বললো না গীতা। চুপচাপ হোটেলের পথে ফিরে এলো সে, অভিমানে ভেঙে পড়তে চাইলো তার মন।

এতদিনের নিরানন্দ একঘেয়ে জীবনে, এত অভাব-অনটন ব্যথা-ব্যর্থতার মধ্যেও কোনদিন শান্তনু তাকে এ-ভাবে অপমান করে নি।

এতগুলি লোকের চোখের সামনে শান্তনু যেন চিৎকার করে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের এই হাসি-ফুর্তি, আনন্দ আর তৃপ্তির উচ্ছ্বাস যেন একটা মেকী জীবনের মুখোশ। যেন এসবের আড়ালে তারা রিক্ত, বঞ্চিত, মিথ্যা।

একটাও কথা বললো না আর গীতা।

একবার ভাবলে, ঝিনুকের কৌটোটা আর খুলবে না। যাবে না সমুদ্রের পাড়ে। ঝিনুক কুড়োবে না।

কিন্তু শান্তনুকে জবাব দেবার জন্যেই যেন নতুন উৎসাহে ঝিনুক কুড়োতে শুরু করলো সে। চাঁদনী রাতের আবছা আলোয় যতদূর চোখ যায়, চলে যেতো ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে, তার চেয়েও দূরে।

না কি শান্তনুই দূরে চলে গেলো? গীতার কাছ থেকে, গীতার পৃথিবী থেকে!

শান্তনু আর কোন কথা বললো না। আর কোন কথা বলে নি কোনদিন।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। সেই সমুদ্রের মুক্তি থেকে একঘেয়ে জীবনের বন্ধনে ফিরে এসেছিলো ওরা। কাজে, কর্তব্যে, নিরলস ক্লান্তিতে।

কত কত দিন পার হয়ে গেছে তারপর, কত বছর। সেই তিক্ত অথচ তৃপ্ত দিনগুলোকে যেন ভুলেই গিয়েছিলো গীতা।

ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর কত কিছুই তো ভুলে গেছে সে। শুধু ভোলে নি, সংসারের সব দায়িত্ব এখন তার ওপর। রুমার দায়িত্ব, তার নিজের ভার।

তবু এক-একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তার শরীরের দিকে তাকিয়ে তার শরীরে-জড়ানো শ্বেতশুভ্র থান কাপড়ের দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠে গীতা।

আজ সকালেও তেমনি শিউরে উঠেছিলো। কি আশ্চর্য, এত-বার চেষ্টা করেও শান্তনুর মুখখানা মনের পটে স্পষ্ট করে আঁকতে পারে নি সে। কেমন একটা অস্পষ্ট ছায়া ছায়া স্মৃতি শুধু। ব্যথা নেই, বেদনা নেই, শুধু একটা অবোধ্য মায়া। আর কিছু নয়।

এই বাড়ি, যার আলোয় বাতাসে শান্তনুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে, ভেবেছিলো গীতা, সেই বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার মুহূর্তে একবার শান্তনুর মুখখানা মনের চোখে জাগিয়ে তুলতে, জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলো সে, পারে নি।

কি আশ্চর্য, এমন যে হবে, এমন ভাবে হারিয়ে যাবে শান্তনু, ভাবতেও পারে নি গীতা।

খাট-আলমারি, আসবাবপত্র নামানো হয়েছে। একটা একটা করে জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে তোলা হচ্ছে লরীটায়।

আলমারিটা সরাতেই দেয়ালের শেল্‌ফে চোখ গেলো গীতার।

মাকড়সার জাল আর ঝুলে ঢাকা ওটা আবার কি ?

এগিয়ে গেলো গীতা। তুলে আনলো। ঝনঝন একটা শব্দ হলো। কি আছে এর ভেতর, এই কোণে পড়েই বা আছে কেন ?

একটা গুঁড়ো দুধের টিন।

ভিতরে কি আছে দেখবার জন্যে কৌটোটা খুললো গীতা। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো।

ঝিনুক। ঝিনুক, রাশি রাশি রঙ-বেরঙের ঝিনুক !

কৌটোটা নিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে গেলো গীতা। কী বিশ্রী দুর্গন্ধ কৌটোটার।

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো গীতা। কৌটোটা ফেলতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালো।

পারলো না। ভুলে-যাওয়া সেই দিনগুলির ঝাপসা একটা স্মৃতি জেগে উঠলো চোখের সামনে।

আট বছর এই কৌটোটার কথা মনেই ছিলো না তার, হয়তো এরপরও আর মনে পড়বে না। তবু ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলো না গীতা। একটা দীর্ঘশ্বাসের চাদরে সযত্নে মুড়ে রাখলো।

শান্তনুও বুঝি তার জীবনে এমনি এক ঝিনুকের কৌটো !

ইমলী

শহরের এদিকটায় কর্পোরেশনের সীমান্ত টেনেছে পূব-পশ্চিমের রেল-লাইন। মাটি থেকে অনেকখানি উঁচু একটা পাড় রেকাবির কানার মত গোল হয়ে ঘিরেছে শহরের দক্ষিণাংশ।

উত্তর-দক্ষিণের ট্রাম লাইনটা এক জায়গায় নাক ঢুকিয়েছে ওদিকের মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়। ট্রাম-লাইনের ওপারে একটা পুল, পুলের ওপর দিয়ে দু'দশ মিনিট অন্তর একটা না একটা ট্রেন হুইসল্ বাজিয়ে যায়, ইঞ্জিন ধোঁয়া ছাড়ে। পুলের ওদিকে এখনও কাদা মাটির রাস্তা, পচা পাঁকের ডোবা, কচুরিপানার দুর্গন্ধ। অথচ এদিকে চকচকে ইস্পাতের মতো পরিচ্ছন্ন রাস্তার পাশেই তকতকে একসারি অট্টালিকা। জানালায় তার রঙিন পর্দা, বারান্দায় ইলেকট্রিকের ম্লান নীল আলো, ব্যালকনির বেতের চেয়ারে স্থূল চেহারার আসর। যে-কোন একটার সামনে দাঁড়ালেই শোনা যায় চুড়ি টুং-টাং কথালাপ, নেপথ্যে নরম কলহাস্য, আর রেডিয়োর কণ্ঠে ঠাণ্ডা গলার গান।

রাস্তাটা ছায়া-ছিমছাম। ল্যাম্পপোস্টগুলো দূরে দূরে, কৃষ্ণচূড়া আর গুলমোহরের পাতায় আড়াল পড়া নিস্তব্ধতা। সিমেন্টে-বাঁধানো চওড়া ফুটপাতে কেমন একটা অন্ধকারের ছমছমানি। শুধু অন্ধকারই নয়, আরেকটা জিনিস চোখে পড়লে শিউরে ওঠা উচিত। কিন্তু চোখে পড়েও চোখে পড়ে না।

ফুটপাতের ওপর সারি সারি মানুষের কার্টুন। এক পাল মেয়ে-পুরুষ, কাচ্চা-বাচ্চা, তেলচিট কাপড় আর উকুনজট চুলের বীভৎসতা নিয়ে সারা ফুটপাত জুড়ে শুয়ে থাকে। শুয়ে থাকে তারা-ফোটার সন্ধ্যে থেকে। রোগা জিলজিলে চেহারা কারো, পাঁজর-বের-করা

বাচ্চাগুলোর পিপের মত পেট, পুরুষগুলোর কানে মাকড়ি। দু'দশটা মেয়ের শরীরে মাংস আছে, যার নেই তার চোখে তেজ।

ফুটপাতের গায়েই দুটো না তিনটে বে-দরোজা খুপরি পড়ে আছে অন্ধকারে, আলো-ঝলমল এক সারি দোকানের মাঝে। চকমকি-চোখ সুন্দর একটি বাচ্চা মেয়ের ফোক্‌লা দাঁতের মত ছন্দপতন। দোকান ভাড়া দেওয়ার জন্যে কাজে হাত লাগিয়ে শেষ অবধি আর টাকায় কুলিয়ে ওঠে নি হয়তো বাড়িওয়ালার। কিংবা কোন মামলা মোকদ্দমায় ফেঁসে গেছে হয়তো।

দেয়াল আর ছাদ দু-ই আছে ঘর ক'খানার, কিন্তু কপাট বসে নি, সিমেণ্ট হয় নি মেঝেতে, দেয়ালে প্লাস্টার না পয়েন্টিং কি উদ্দেশ্য ছিল বোঝাই দায়। রাস্তার ওপর যারা শুয়ে আছে, তাদের দলেরই কয়েকজন এসে আশ্রয় নিয়েছে ঘর ক'খানার ভেতর। কুকুর-কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

রাত ন'টাও হয় নি তখন, কিন্তু ঘুম দু'প্রহর পুরনো হয়ে গেছে ওদের।

দুটো ভদ্রলোকের পোশাক এসে দাঁড়ালো সেখানে। তাকালো তারা এপাশ ওপাশ। ঘুমন্ত কোন মেয়ের জাগর কোন অংশের দিকেও হয়তো বা।

একটা পোশাক বললে, না! তাড়ানো যাবে না। রিফিউজিরা শুয়ে আছে।

অন্য পোশাকটা বললে, পেলে কিন্তু ভালই হ'ত। দোকানের পজিশনটা দেখেছেন?

—উপায় নেই মশাই। রিফিউজিরা দখল করে বসেছে যখন, চেষ্টা করাই বৃথা।

রিফিউজি? একটি পোশাক এগিয়ে গেলো, ঝুঁকে দেখলে লোকগুলোকে। বললে, রিফিউজি তো নয় মনে হচ্ছে মশাই!

—নয়? উৎসাহিত হয়ে উঠলো অন্য পোশাকটি—দেখুন, দেখুন ভালো করে। তা হ'লে তো মেরে হটিয়ে দেয়া যাবে।

হু'জনেই ঝুঁকে পড়লো।

স্পষ্ট আলো নেই, ঝরা-পাতার কৃষ্ণচূড়া গাছটা যেটুকু চাঁদকে উঁকি দিতে দিয়েছে তার আলোয় কিছুই ভালো দেখা যায় না। একদল ময়লা মানুষ—এইটুকুই চোখে পড়ে।

সন্দেহ দূর করার জন্যে ঘরটার কাছে এগিয়ে গেলো একজন, খাটো শাড়ির ঢেউটার দিকে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখতে চাইলো।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলী কণ্ঠের প্রতিবাদ এলো—আওরত দেখ নি কখনো, উল্লু কাঁহাকা।

সব কথাটা আর শুনতে হ'ল না, ছিটকে দূরে সরে এলো ভদ্রলোকের পোশাক-পরা লোকটি।

—চলুন মশাই চলুন, গোলমাল বাধিয়ে দরকার নেই।

—হ্যাঁ, কাল বরং বাড়ি খোঁজ করা যাবে। রিফিউজি যখন নয় তখন মেরে হটিয়ে দেয়া যাবে।

বাড়ির পথ ধরলো হুটো পোশাকই। আর ইম্‌লী উঠে বসলো। উঠে বসে এদিকে ওদিকে তাকালো। ওদের পালানো দেখে হাসলো মনে মনে।

ইম্‌লী মানে তেঁতুল, তেলেগু ভাষায় যার নাম চিন্তাপাণ্ডু। চেহারা দেখে ভুল হলেও আসলে ইম্‌লী কিন্তু তেলেঙ্গী নয়। মুখে হিন্দী-উর্দু'র ফরফরানি থাকলেও আইনের চোখে ও খাস বাঙালী।

মেয়েটার বাপ-মা মারা গেছে—না বে-ঠিকানা, তা ইম্‌লী নিজেও হলফ করে বলতে পারে না। কিন্তু যে ওর নাম রেখেছিলো সে হয়তো আভাসে বুঝেছিলো এ মেয়ে বাঘা তেঁতুলকেও হার মানাবে।

শরীর তো নয়, যেন স্বাস্থ্যের জোয়ার। পুরোনো তামার মত গায়ের রঙ, চোখের কোলে সরু একটা কাজল-রেখা সুর্মা টানার

অপেক্ষা রাখে নি। ভরা ভরা ঘাম-ঝরা কালো মুখের সঙ্গে খাপ খায় না মাথার একরাশ জটপাকানো চুল। রঙিন ডুরে শাড়ি একখানা পরনে, এতই খাটো মাপের যে ইজ্জত ঢাকে তো শরম ঢাকে না। ময়লা আঙিয়াটা বুকে পিঠে এমনই আঁটসাঁট হয়ে আছে যে না থাকলেও ক্ষতি ছিলো না।

লোক দুটো চলে যাওয়ার পর দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলো ইম্‌লী। মাথা চুলকোলে খানিকক্ষণ। আন্দাজে আন্দাজে দু'আঙুলের দুটো নখে একটা উকুন চেপে ধরলো, চোখের সামনে এনেও দেখতে না পেয়ে নখের পিঠে নখ টিপে মারলে উকুনটা। তারপর আবার মাথা চুলকোতে শুরু করলে।

মুখে না মানলেও জাতে সাচ্চা বেদিয়া ওরা। কথাবার্তায়, হাবে-ভাবে কিছুটা হিন্দুয়ানী কিছুটা মুসলমানী। মনটা পাক্কা বেদের। স্বভাবে আর নেশায় বেদে ছিল ওদের পূর্বপুরুষরা, ঘুঙুর-বাঁধা হাত-ঢোলক বাজিয়ে নেচে গেয়ে বেড়াতো। তাঁবু নয়তো হোগলার ছাউনি যতবার গড়তো ততবার ভাঙতো, বন মোরগের ঝাঁকের মত উড়ে উড়ে বেড়াতো এখানে সেখানে। গানের ভাষায় বলতো, রাস্তাই আমাদের জাহান, ফাটা তাম্বু আমাদের দরবার। স্বপ্ন দেখতো, মাশুক শুধু নাচবে গাইবে ঢোলক বাজাবে, আর আশক চাক্কু বেচবে চকবাজারে।

স্বভাবে আর নেশায় বেদে ছিল পূর্বপুরুষরা, অভাবে আর পেশায় বেদে হতে হ'ল ইম্‌লীদের।

সুন্দরবনে জঙ্গল সাফ করে চাষ-বাসের জমি পেয়েছিলো ওরা ইজারাদারের কাছ থেকে। ঘন অরণ্যের হিংস্রতায় ডেরা বেঁধেছিলো দলকে দল। বুনো মোষ, বাঘ, ভালুক, নীল গাই তাড়িয়ে বন জঙ্গল পরিষ্কার করেছে, রামহরিণ আর হরিয়াল শিকার করেছে। বনের জমিকে সোনা-ফসলের জমি বানিয়েছে, মাটি ভিজিয়েছে গতরের

ঘামে, রোপাই বুনেছে ভাতুই তুলেছে বছরের পর বছর। তারপর ইজারাদার এসে একদিন বলেছে, খাজনা চাই। খাজনা দিয়েছে, খাজনা বেড়েছে। ভাবে নি কোন দিন, হঠাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে দেবে ইজারাদার, জমি ছেড়ে দিতে বলবে।

ডুগডুগি বাজলো একদিন। ইম্‌লীদের দলকে আর দরকার নেই ইজারাদারের, মোটরের লাঙল দিয়ে চাষ করবে সে নিজেই। জোয়ান চেহারার কেউ কেউ দিন-মজুরের কাজ পেলো, বাকী লোকগুলোকে তাদের ডেরায় থাকতে দিলো শুধু। চাষের জমি কেড়ে নিলো সব।

বেদের নেশা মুছে গেছে মন থেকে, স্বভাব শিকড় গেড়েছে সময়ের মাটিতে। এত কষ্টের ডেরা ছেড়ে যাবে কোথায়? মাটির মায়া কি এত সহজে ছাড়া যায়? আরো গভীর জঙ্গলের দিকে সরে গেলো ওরা, ভালুকের সঙ্গে রেশারেশি করে মৌচাক ভেঙে মধু জমালে। একবার করে শহরে এসে মধু ফিরি করে সারা বছর চলতো কোন ক্রমে।

দলবলের সঙ্গে এবারেও মধু বিক্রয় করতে এসেছিলো ওরা শহরে। লোকের মুখে ইম্‌লীর নাম হলো মধুওয়ালী। কিন্তু ও মধু ফিরি করবে কি, শহরে এসে মধুর খোঁজ পেলো ও নিজেই।

দলে জোয়ান চেহারার অভাব ছিলো না। তাদের দু'চারজন কি কখনো সখনো চোখের ডাকে হাতছানি দেয় নি ইম্‌লীকে? ইম্‌লী নিজেও হাসাহাসি করেছে, ছুঁড়েছে দু'চারটে দিল্-জখমী দিল্লাগী। কিন্তু তারা তো কৈ এমন ভাবে নাড়া দেয় নি ওর মনকে!

জঙ্গলের মধু আর মোম নিয়ে এর আগেও দু'দুবার এসেছিলো ইম্‌লী। তখনও শহর এমন বদলে যায় নি। রোজগারের টাকায় শুধু একবেলা চাপাটি খাওয়াই নয়, বেশ কিছু পয়সা ঘুনসির গেজেতে পুরে ডেরায় ফিরতো তখন।

এবারে কিন্তু দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করেই হয়রান হয়ে পড়লো ইম্‌লী।

ভোর না হতেই ফুটপাথটা জেগে উঠতো প্রতিদিন। মধুর হাঁড়ি মাথায় চাপিয়ে একে একে সবাই এ গলি সে গলি ধরে মধু ফিরি করে বেড়াতো চিৎকার করে করে। মুখের মিষ্টি ডাকে গলা শুকিয়ে কর্কশ স্বর বেরোতো দুপুর না হতেই। তবু খদ্দেরের হদিস মিলতো না। দেড় ক্রোশ পথ হাঁটার পর হয়তো তেতলা বাড়ীর জানালা থেকে মেয়ে গলার ডাক আসে, মধু চাখে বাংগালী বহু, দর-দস্তুর করে, তারপর দড়াম করে কপাট বন্ধ করে দেয় মুখের ওপর। মনের ঝাল মিটিয়ে গালাগালি দিতে দিতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসা, তারপর আবার পথ চলা। ভাবে, এত জলের দরেই যদি বেচতে হবে তো পট্টির ফড়িয়া কি দোষ করলে!

এমনিভাবে ইম্‌লীও প্রতিদিন সারাটা দুপুর ঝমঝমে রোদে ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যের সময় ফুটপাথের আড্ডায় ফিরে আসতো। ফিরে এসে শুকনো মুখে বসে বসে ধুঁকতো হাঁটুতে থুতনি রেখে। সকালে চিঁড়ে জোটে তো সন্ধ্যের চাপাটির পয়সা থাকে না। সারাদিন রাস্তার কলে মুখ ভিজিয়ে বুক ভরা ঠাণ্ডা জল খেয়ে কাটে।

আড্ডার সবারই মুখ শুকোয় ক্রমে ক্রমে। সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে খবর নেয় ওরা পরস্পরের, শুধোয় কার কত বিক্রি হলো, হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়োরা; শরীফদের জেবও কমজোর হয়ে গেছে।

অথচ মধু বিক্রি না হলে গাঁও-দেহাতে ফিরবে কোন সাহসে, সারা বছর চলবে কিসে? জীবনে এমন শুখা দিন আসে নি কখনো, ভাবলে সবাই।

সারা দুপুর রোদে টহল দিয়ে ফিরছিলো ইম্‌লী, ভাবছিল সন্ধ্যের ভাবনাগুলোই। ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে চোখ জ্বলছে তখন, মুখের

চামড়া তাওয়ার মত তেতে উঠেছে, অসহ্য ঠেকছে গায়ের আঙিয়া। ছায়া খুঁজতে খুঁজতে একটা গলিতে ঢুকে পড়লো ইম্‌লী। তেলে-ভাজার দোকানের পাশ দিয়ে বেঁকেছে গলিটা। পোড়া তেলের মিষ্টি গন্ধটা নাকে আসতেই লোভী চোখে সেদিকে তাকালো, চোখে পড়লো ওপাশের বারান্দায় একজন ফুচকাওয়ালাকে ঘিরে হাতে শালপাতার ঠোঙা নিয়ে বসেছে জনকয়েক রং-ঝলমল চেহারার পাঞ্জাবী মেয়ে। রাস্তার ধারে হলদে ঠেলাগাড়ী থেকে কুলপী বরফ বিক্রি করছে একজন। আনমনে কোমরের বটুয়ায় হাত দিয়ে খুচরো পয়সার স্পর্শ নিলো ইম্‌লী, তারপর তরতর করে এগিয়ে গেলো লোভ সামলে। সামনেই সিমেণ্ট-বাঁধানো চওড়া একটা রক। ছায়ায় ভিজে আছে যেন। একটা লোক শুধু কাঁচ আর এলুমিনিয়ামের বাসন-সাজানো ঝুড়ি নামিয়ে অংগোছা নেড়ে নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে।

এক পাশে ছায়ায় হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে বসলো ইম্‌লীও। তারপর হঠাৎ চোখোচোখি হলো লোকটার সঙ্গে। মধু ফিরি করতে এসে নিজেই মধুর খোঁজ পেলো ইম্‌লী।

রোগা, কিন্তু শিশু কাঠের মত কালো আর মজবুত চেহারা লোকটার। কানে লাল মাকড়ি। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। পরনে নতুন জামা।

জাতে লোকটা ওদেরই মত বেদে, বুঝলে ইম্‌লী। শহরে অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে এই যা। শহরের লোক হাজার ময়লা কাপড় পরে থাকলেও চিনতে পারে ও, কেমন একটা মুখে চোখে পালিশ পড়ে শহরে থাকলে।

একবার চোখোচোখি হওয়ার পরই কাজে মন দিলো লোকটা, টাকা পয়সা গুনলে, আরো কি কি যেন করলে, চোখ তুলে একবারও আর দেখলে না, ইম্‌লী মোহময় দৃষ্টিতে, মহব্বতের দৃষ্টিতে ঠায় তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে ইম্‌লী, আবার চোখোচোখি হওয়ার আশায়। তারপর কখন যেন চোখ সরে গেল ওর, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো।

—এ মধুওয়ালী!

হিসেব নিকেষ শেষ করে ঝুড়ি থেকে একটা খাবারের কৌটো বের করে ডাক দিলে লোকটা। তারপর নিজেই উঠে এলো ইম্‌লীর কাছে।

মধু চাইলে এক আনার, কৌটোটা খুলে ইম্‌লীর সামনে ধরে।

হেসে কি একটা ঠাট্টা করলে ইম্‌লী। এক আনার মধু? হেসে উঠলো আবার। সের হিসেবে বিক্রি হয় মধু, বড় জোর পাও ভর নিতে পারে সে। তা বলে এক আনার?

লোকটাও হাসলে। হেসে ঠাট্টার জবাব দিলো। যে চিজ যত কমদর সে তত বেশি ওজনেই তো বিক্রি হয়। কয়লা বিক্রি হয় মণ হিসেবে, মধু সের দরে, আর সোনা চাঁদি আর ওই এলুমিনিয়ামের বর্তন বিক্রি হয় তোলা হিসেবে।

মুখের মত জবাব হলেও অপ্রতিভ হলো না ইম্‌লী। জাত জনম্ গাও-দেহাতের ঠিকানা নিলো, তারপর বললে, পয়সার দরকার নেই, মুফ্‌ৎ দিয়ে দিচ্ছি। বলে এক হাতা মধু ঢেলে দিলো লোকটার রুটিতে।

ইম্‌লীর কোলের ওপর দু'খানা রুটি ফেলে দিলো লোকটা, নে, তুইও খা দু'খানা।

বাধা দিলো না ইম্‌লী, ফিরিয়ে দিতে চাইলো না। শুধু চোখ টিপে হাসলো।

রুটি চিবোতে চিবোতে খবর নিলো সে, কত মধু বিক্রি হয় দিনে, নাফা হয় কত?

যতটা সম্ভব বাড়িয়ে বললে ইম্‌লী, তবু আশ্চর্য হয়ে চোখ

কপালে তুললো লোকটা।—ব্যস? অর্থাৎ এত কমে চলে কি করে ইম্‌লীর?

উপদেশ দিলে টুটা-ফাটা কাপড়ার বদ্‌লি বর্তন বিক্রি করতে। অনেক বেশী লাভ হবে। পট্টির পাইকারের কাছে মধুর হাঁড়িটা বেচে দিয়ে টাকাটা মহাজনের কাছে জমা রাখলে সেও কাঁচ আর এনামেলের বাসন পাবে। তারপর পুরানো কাপড়ের বদলে সেগুলো বিক্রি করে মহাজনের কাছেই টাকা পাবে টুটা-ফাটা কাপড়ের জন্যে।

ইম্‌লী ভাবলে, সত্যিই তো। মধু আর ক'জন খায়। কিন্তু বর্তনের দরকার সকলেরই, টুটা-ফাটা কাপড় তো সকলেই ফেলে দেয়।

বললে, কাল আসবো। ভেবে দেখি।

বেশ খানিকটা ও যখন এগিয়ে গেছে লোকটা নাম জিগ্যেস করলে ইম্‌লীর। নাম বললে ইম্‌লী, চোখেচোখে কি একটা অর্থপূর্ণ হাসি খেলে গেলো, ওর নামও জিগ্যেস করলে ইম্‌লী।

—ফাল্‌সা।

এ গলি সে গলি ঘুরে বেড়ালো ইম্‌লী সারা বিকেল, মুখে ঘুরলো মধু ফিরির ডাক। কিন্তু মনের ভেতর ঘুরলো শুধু ওই একটাই নাম, ফাল্‌সা।

মধুর মতই মুখে লেগে রইলো এ নাম, সারা দিন শুধু একটা তৃপ্তির হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে রইলো ও।

দলের সকলকে বললে ইম্‌লী। হেসে উড়িয়ে দিলো সকলে।

শহরে ব্যবসা করে কুত্তা আর বিল্লির মত সারা বছর রাস্তায় পড়ে থাকতে তো আসে নি ওরা। না হয় শেষ অবধি পাইকারের কাছেই বেচে দিয়ে যাবে সব মধু, তারপর ফিরে যাবে ডেরায়।

পাতার ছাউনী দেয়া জংলী ডেরাও এর চেয়ে অনেক সুখের। মেঠো খরগোশের মাংস খেয়েও পেট ভরানো যায় সেখানে।

ওরা কেউ বুঝলো না শহরে থাকার এত লোভ কেন ইম্‌লীর।

এ এক অদ্ভুত নেশা। চেষ্টা করেও এ নেশা ছাড়াতে পারলো না ইম্‌লী।

তুপুর হলেই কি এক তুর্বোধ্য আকর্ষণ যেন সেই গলির দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে। কোনদিন ফাল্‌সার দেখা মেলে, আর কোনদিন হয়ত বা সেই ছায়া-ভেজা রকে বসে অপেক্ষা করে সে ফাল্‌সার জন্যে। ঘামে ভিজে ফুটন্ত রোদ্দুরে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে হাজির হয় সে, ইম্‌লীর দিকে চোখ তুলে না তাকিয়েও খুশিতে ভরে ওঠে তার মুখ। তারপর প্রতিদিনের মতই খাবার ভাগ করে খায়।

তুপুরের আলাপ ক্রমে সন্ধ্যে অবধি জের টানতে শুরু করলো। আড্ডায় ফিরতে দেরি হতে লাগলো ইম্‌লীর। সন্ধ্যের পর কোন একটা রাস্তার কলে স্নান সেরে নির্জনে কোথাও গিয়ে বসে তু'জনে, গল্প করতে করতে রাত ভুলে যায়। রাস্তা থেকে কেনা চিনাবাদাম চিবোতে চিবোতে পা ছড়িয়ে ঘাসের জাজিমে বসে গল্প করে তু'জনে অনেক রাত অবধি, আড্ডায় ফিরে নানা ওজর দেখায়।

কেউ কিছু বিশেষ মনেও করে না তার জন্যে। বড় জোড় ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তু'চারটে, আড়ালে হাসাহাসি করে। কম-বয়েসের মেয়েগুলো এমন দেরি করে ফিরবে তা আর নতুন কি, ফিরতেই তো ভুলে যায় অনেকে।

ইম্‌লীও ফিরলো না একদিন।

টিনের শেড দেয়া মাটির দেয়ালে ঘেরা ছোট্ট একখানা বস্তির ঘর, টুকরো-টাকরা তু'চারটে আসবাব, একটা দড়ির খাটিয়ায় নোংরা বিছানা। তবু প্রথম যেদিন এলো, ফাল্‌সার এ ঘরখানা খুব আপন মনে হলো ইম্‌লীর। একটা কেরোসিনের লম্ফ জ্বেলে চাপাটি

বানাতে বানাতে মনে হলো সারা জীবন যদি এমন একখানা ঘরে কাটাতে পায়, ফাল্‌সার মত একটা মানুষকে যদি রেজাই বানাতে পায় শীতের রাতে।

নিজের ঘর দেখাবার জন্যে ইম্‌লীকে ডেকে এনেছিলো ফাল্‌সা। চোখ আর মন শুধু পিয়ার মোহব্বতের ইশারা দেখিয়েছিলো, মুখের কথায় দু'জনেই রসিকতা করতো শুধু। মন জানাজানি হয়নি কোনো দিন, মোহব্বতের কথা উচ্চারণ করে নি কেউই।

আর ফাল্‌সার ঘর দেখতে এসেও ইম্‌লী মুখ ফুটে বললো না কিছু। চাপাটি বানালে, গল্প করলে, দু'জনে খেয়ে-দেয়ে নিলো। তারপর দড়ির খাটিয়াটায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ইম্‌লী। বললে, নিদ্‌ আসছে চোখ জুড়ে। ফিরতে পারবো না আমি।

ফাল্‌সা হাসলে, লম্পটা নিবিয়ে দিয়ে এসে ইম্‌লীর পাশেই শুয়ে পড়লো সেও।

ভোর বেলায় যখন ঘুম ভাঙলো, ইম্‌লীর শরীরে জড়তা নেই, মনে তবু তার অপরিসীম লজ্জা। পিঠের ওপর থেকে ধীরে ধীরে ফাল্‌সার হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো সে বিছানা ছেড়ে। ফাল্‌সা ঘুমোচ্ছে তখনও, ঘুমোক। জেগে থাকলে কি করে চোখ তুলে চাইতো ইম্‌লী, লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হতো না ?

মধুর হাঁড়িটা মাথায় নিয়ে তর্‌তর্‌ করে চলে এলো সে। কি করে এমন মাতোয়ালার মতো টলতে টলতে এগিয়ে গিয়েছিলো ইম্‌লী, লজ্জা হলো তার। এমন বেশরম মেয়ে হয়তো আগে দেখে নি ফাল্‌সা। আর এমন তাজ্জব আদ্‌মী ইম্‌লীও দেখে নি কখনো। একই খাটিয়ায় পাশাপাশি শুয়ে ঘুমের ঘোরে শরীরে হাত ছুঁইয়েও পাগল হয় না এ কেমনতরো জোয়ান পুরুষ! এত হাসি-ঠাট্টা ইশারা-ইঙ্গিত—অথচ হাতের নাগালে পেয়েও...

এ গলি সে গলি হয়ে মধু ফিরি করে বেড়ালো ইম্‌লী। বার

বার দুপুরের ছায়ায় ভেজা রক্টা পা টানলো তার, তবু লজ্জা এসে পথ রুখে দাঁড়ালো। গলিটা দু'তিনবার পার হলো ইম্‌লী, তবু ঢুকতে সাহস পেলো না।

সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এলো সে ফুটপাতের আড্ডায়।

দলের দু'চারজন মুখ টিপে টিপে হাসলো, চোখ টিপে ইঙ্গিতে কি যেন বলাবলি করলো। এমন তো হামেশাই হয়। ইম্‌লীর সমবয়সী দুটো মেয়ে চুপচাপ এসে বসলো ওর কাছে, কোমরের ঘুনসিটা দেখাতে বললে। দেখলে তারা, খুচরো কয়েক আনা পয়সা। খিলখিল করে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো। ব্যস্, এই ক'আনা পয়সা! চোখ কপালে তুললো তারা। এমন ভরা যৌবনের আঁটসাঁট চেহারা, একটা পুরো রাত হারিয়ে গিয়ে কিনা এই ক'আনা পয়সা! এত সস্তায় শরীরের মধু বেচেছে ইম্‌লী!

কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো, কেন ফেরে নি—এসব প্রশ্ন কেউই করলো না। এ বয়সে যদি এমন মাঝে মাঝে না হারাবে তো রূপের ইজ্জত রইলো কোথায়।

ঠাট্টাটা বুকে এসে বিঁধলো ইম্‌লীর, তবু বলতে পারলো না কোন শহরওয়ালার হাতছানি, কোন টাকার লালচ ডেকে নিয়ে যায় নি তাকে। পুলের ওপারে ডাণ্ডি বস্তিতে গিয়েছিলো পিয়ারবন্ধুর সঙ্গে, ফিরেছে ইজ্জত নিয়েই।

ইজ্জত!

নিজের কাছে নিজেই যেন ছোট হয়ে গেছে ইম্‌লী। মুহূর্তের দুবলামি কাটিয়ে ফিরেছে ও, খুশিই হয়েছে সে-কারণে। কিন্তু ফাল্‌সা? কি ভাবছে সে?

যথেষ্ট বেশরমী কাজ করেছে ইম্‌লী, আরো বেশরম হতে পারবে না। ফাল্‌সার সঙ্গে আর দেখা করতে পারবে না ও, তাকাতে

পারবে না চোখে চোখ রেখে। দলের সঙ্গেই ফিয়ে যাবে ফড়িয়ার কাছে সব মধু সস্তা দরে বেচে দিয়ে।

পুরো দল একসঙ্গে ফেরে না কোনবারই। যার মধু শেষ হয়ে যায় সে সরে পড়ে আগেই, এবারেও একে একে অনেকেই কেটে পড়লো। দল ফিকে হয়ে গেল দু'দিনেই। কেউ ফিরে গেলো, কল-কারখানায় কাজ জোটালে কেউ, কেউ বা বেখোঁজ হলো।

ইম্‌লীও একদিন পট্টির পাইকারের কাছে বেচে দিয়ে এলো সব মধু, ঘুনসিতে গোটা কয়েক টাকা গুঁজে বে-দরোজা দোকানঘরের দেয়ালটায় ঠেস দিয়ে বসে বসে ভাবলে। এ ক'টা টাকায় কি চলবে সারা বছর? জঙ্গলের ডেরায় গিয়ে কি করবে সে, খাবে কি? তার চেয়ে শহরে থেকে টুটা-ফাটা কাপড়ার বদলি এলুমিনিয়ামের বর্তন বিক্রি করা অনেক ভালো।

ফুটপাথে পড়ে পড়ে সারা রাত ঘুমিয়ে ভোর বেলায় উঠেই ভেবেছে, আজ দেখা করবো ফাল্‌সার সঙ্গে। দুপুরের সেই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অধৈর্য আবেগে পায়চারি করে বেড়িয়েছে। অনেক আগেই এসে পৌঁচেছে গলির মোড়ে। বহুবার চেষ্টা করেছে তবু ঢুকতে পারে নি। গলির মোড়ে ঘোরাঘুরি করেছে বারবার, যদি হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তারপর কখন দুপুর পার হয়ে বিকেল হয়ে গেছে। নতুন উত্তেজনায় পুল পার হয়ে বস্তির দিকে হেঁটে গেছে ইম্‌লী, দূর থেকে দেখেছে বস্তিটা, এমন কি ফাল্‌সার ঘরখানাও দেখেছে দূর থেকে, তারপর মনকে বুঝিয়েছে, এত তাড়া কিসের, কাল আসা যাবে।

এমনি করে কয়েকদিন কাটলো, খালি হয়ে এলো ওর কোমরের থলি। শেষে একদিন সব শরম পায়ে মাড়িয়ে এসে উপস্থিত হলো। এপাশ ওপাশ তাকালো চোরা চোখে। না, ফাল্‌সা নেই। ছায়া-

ভেজা গলির ভেতর রকে বসে খেলা করছে দুটো বাচ্চা ছেলে। সারা দুপুর অপেক্ষা করে অধীর হয়ে উঠলো ইম্‌লী। পায়ে যেন ক্লান্তি নেই, বিশ্রাম নেই মনের। একদিকে হতাশা, একদিকে অধৈর্য। এতদিন শুধু লজ্জার কথাই ভেবেছে ইম্‌লী। কৃপণ মানুষের মত মাটি খুঁড়ে না দেখেও জেনেছে ঐশ্বর্য ঠিকই লুকোনো আছে। সব হারাতে বসেছে দেখে প্রাণের আবেগে মাটি খুঁড়ে চললো ইম্‌লী। মনকে বোঝালে, আছে আছে, আরো নীচে লুকিয়ে আছে।

দ্রুতপায়ে পুলপারের বস্তিতে এসে হাজির হলো ইম্‌লী। আশঙ্কার স্রোতে লজ্জা মুছে গেলো। ফাল্‌সার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো ইম্‌লী, খোলা জানালায় চোখ রেখে উঁকি মারলো ভেতরে।

না, ফাল্‌সা নেই। ফাল্‌সা চলে গেছে। দড়ির খাটিয়াটাও নেই সে ঘরে। পোড়া ইঁট দুটো আর একটা ভাঙা হাঁড়ি।

পাশের ঘরের ছোক্‌রাটাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে জানলে সব, দীর্ঘশ্বাস আর ব্যথাশ্রু একসঙ্গেই ঝরে পড়লো।

ঘরের ভাড়া বাকী ছিল ফাল্‌সার। সব বিক্রি করে দিয়ে চলে যেতে হয়েছে তাকে। কোথায়? কে জানে কোথায়। সারা পৃথিবীর রাস্তা জুড়েই তো গরীবের ঘর, চাঁদনী আকাশ তো তার তাঁবুর শামিয়ানা।

ফুটপাতের ধারে সেই রে-দরোজা দোকানঘরে ফিরে এলো ইম্‌লী। রাত তখন অনেক। লোক চলাচল ফিকে হয়ে এসেছে। গুলমোহরের ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে এক টুকরো চাঁদের আলো।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে রইলো ইম্‌লী। সব আশা-ভরসা বুঝি ধুয়ে মুছে গেছে। অবশ হয়ে গেছে ওর সারা শরীর।

ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ জুড়ে আসছিলো ইম্‌লীর। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলো ও। চোখ চেয়ে দেখলো একটা ছায়াশরীর এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের পোশাক-পরা লোকটার দিকে

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ইম্‌লী। ভয়ে আশঙ্কায় বুক দুলে উঠলো ওর।

আরেকটা দিনের কথা মনে পড়ে গেল ইম্‌লীর। সেদিনও এমনি অবশ হয়ে গিয়েছিলো সারা শরীর। বাধা দিতে পারে নি ইম্‌লী।

আজ শুধু বাধা দেয়ার শক্তিই নয়, মনের জোরও যেন কমে গেছে। লোভ জেগে উঠছে যেন।

সেদিনের মতোই এসে দাঁড়ালো লোকটা, পায়ে পা ঠেকিয়ে ফিসফিস করে কি যেন বললে। তারপর, হাতের মুঠোয় একটা টাকার স্পর্শ পেল ইম্‌লী। ইচ্ছে হলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটা চড় বসিয়ে দেয় লোকটার গালে। পারলো না।

ছায়াশরীরটা এগিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

ইম্‌লীও ছায়ার মত অনুসরণ করলো তাকে।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কি করে কেটে গেল টের পেল না ইম্‌লী।

লোকটাও আসে না আর। অনেক অন্ধকার রাত জেগে কাটিয়েছে ইম্‌লী। তবু সে ছায়াশরীরের দেখা মেলে নি।

ভিক্ষে করে রাস্তার কলে জল খেয়ে খেয়ে কতদিন আর চালাতে পারে। কাজের চেষ্টায় অনেক ঘুরেছে, আর নয়। কেউ সন্দেহ করেছে চুরি করে পালাবে, কেউ ভেবেছে ঘরে উঠতি বয়সের ছেলেটা বিগড়ে যাবে। কল-কারখানাতেও কোনো কাজ জোটে নি। অনেক ভেবে ইম্‌লীর মনে হয়েছে রাতের অন্ধকারে ওই ছায়ার পথ ছাড়া গতি নেই তার।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে যা মধু বলে মনে হয় দিনের আলোয় তা ফিরি করা যায় না। কোথায় সে উজ্জ্বল যৌবনের লোভানি, শরীরের আদিম উগ্রতা কোথায় হারিয়ে গেলো।

নোংরা রোগা হাড় জিল-জিলে শরীর টেনে টেনে ভিক্ষে করে বেড়ালো ইম্‌লী, আর পাঁচটা ভিখিরীর দেখাদেখি বাঁধা বুলি শিখে নিলো। কিন্তু অমন বিগত যৌবনার হাতে পয়সা দেবে কে?

শহরময় ঘুরতে ঘুরতে রেল স্টেশনের কাছে এসে পৌঁছলো ইম্‌লী। আশ্চর্য! এমন এতোয়ারী হাটের ভিড় কেন স্টেশনে? অসংখ্য মেয়ে-পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা পড়ে আছে কেন উদাস উদ্‌ভ্রান্ত চোখে? কেউ চোখের জল মুছছে, কেউ তাকিয়ে আছে পাগলের মতো। এত চিৎকার হট্টগোল কান্না, কিন্তু হাসি নাই একজনেরও চোখে।

অসহায় দুঃখের ছায়া সকলের মুখে। মাথায় টুপি ছোক্‌রাগুলো ঘুরছে অনবরত। লোকগুলোকে দড়ি দিয়ে ঘিরে রেখেছে কেন এরা, টুপিপরা মেয়েগুলোই বা কি কথা বলছে ওদের কানে কানে।

দু'একজনকে সাহসে ভর করে জিগ্যেস করলো ইম্‌লী।

কি আশ্চর্য! খোট্টা কি সাধে বলে। সারা দেশ জুড়ে উদ্বাস্তুদের কান্নার রোল উঠেছে, আর এই খোট্টা মেয়েটা উদ্বাস্তু কাকে বলে বুঝতেই পারছে না।

জমিজমা সম্পত্তি সব ফেলে রেখে পালিয়ে আসতে হয়েছে লোক-গুলোকে। পিছনে ভর দেবার কিছু নেই, ভবিষ্যতের ভরসা নেই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো ইম্‌লী, বুঝলো কিছুটা।

জল আর পাখা বিলোচ্ছে কেউ কেউ। ওদিকে খাবার দেয়া হচ্ছে ঠোঙায় করে। পুরী তরকারি দিচ্ছে সবাইকে। দু'একজন অনুযোগ করছে, এমন নোংরা খাবার খাওয়া যায় না। দাঁতে চিবোনো যায় না এমন রুটি, বলছে কেউ কেউ।

কিছু বুঝলো, কিছু বুঝলো না ইম্‌লী। একসময় দেখলে নিজেরই অজান্তে কখন সে আর সকলের সঙ্গে এক লাইনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যতই এগিয়ে আসতে শুরু করলো সে সকলের পিছনে পিছনে

ততই আনন্দে চকচক করে উঠলো তার চোখ। পেট ভরে খেতে পাবে সে এতদিনে, পুরী আর তরকারি।

ওর হাতের ওপর যখন খাবারের ঠোঙাটা পড়লো তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছিলো না ইম্‌লীর। পিছনের মেয়েটিকে জায়গা করে দিয়ে সরে যেতে ভুলে গেলো যেন।

খাবার নিয়ে সরে এলো ইম্‌লী। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় গেরুয়া টুপি-পরা ছোকরাটা এসে পথ রুখে দাঁড়ালো ওর।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন শুরু করলে। কোত্থেকে এসেছে, কি জাত, বাংলা জানে কিনা। ভয়ে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেলো ওর। আরো অনেক লোক জুটে গেল চারিদিকে।

কে যেন চেঁচালে, রিফিউজি নয় রে, রিফিউজি নয়।

—জোচ্চুরি করে খাবার মারতে এসেছে।

—রিফিউজিরা খেতে পাচ্ছে না, শালী নেমন্তন্ন বাড়ী ভেবে ছুটে এসেছে।

—মেরে ভাগিয়ে দে মাগীকে।

যার যা মুখে এলো বললো। উত্তেজিত হয়ে উঠলো সবাই। হঠাৎ কে যেন একটা ধাক্কা মারলো ইম্‌লীকে, হাতের ঠোঙাটা পড়ে গেলো দূরে। এদিক থেকে আর একজন কে ধাক্কা মারলে আবার, মাটিতে ছিটকে পড়লো ইম্‌লী নিজেই। চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে তুললো একজন, ঠেলে দিয়ে বললে, যা ভাগ্, আবার আসিস তো মেরে হাড় গুঁড়ো করে দোব।

—যাক যাক, ছেড়ে দে; যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে।

—মেয়ে মানুষ আফটার অল। স্টেশনের বাইরে বের করে দিয়ে আয়, আর মারতে হবে না।

কোন কথাই হয়তো বুঝতে পারলো না ইম্‌লী, চোখ বেয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়লো তার।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে স্টেশনের বাইরের সিঁড়িতে বসে রইলো ইম্‌লী। হঠাৎ যেন বমির বেগ এসে ঠেকলো গলায়। খালি পেটেও বমি আসে কেন? উঠে দাঁড়াতেই মাথাটা ঘুরে গেল তার। বসে পড়লো আবার।

হঠাৎ চোখ গেলো তার, সাজপোশাক-পরা একটি মেয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মেয়েটাকে একটু আগেও দেখেছে ও স্টেশনে ঘুরে বেড়াতে। মেয়েটার চোখ-মুখ দেখেই কেমন যেন খারাপ লেগেছিলো ইম্‌লীর।

মেয়েটা এগিয়ে এলো ওর কাছে। পাশে বসে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলো।

বললে, সব জানোয়ারের দল, চল্ তুই আমার সঙ্গে। বাড়িতে ওর চেয়ে অনেক ভালো খাবার দেবো চল্।

মুখ তুলে তাকালে ইম্‌লী, গাল বেয়ে টপটপ্ করে জল ঝরে পড়লো। এই মেয়েটাকে কিনা খারাপ লেগেছিলো তার! রিক্‌শায় মেয়েটির পাশে বসে ভাবলে ইম্‌লী।

ছোট্ট একখানা ঘরে ঢুকলো ওরা রিক্‌শা থেকে নেমে। সাজানো গোছানো ছোট্ট একখানা ঘর। আরো দু'চারটে রং-মাখা মেয়ে এলো দেখতে, হেসেই কুটিকুটি তারা। গড়িয়ে পড়লো এ ওর গায়ে।

—কি, খাবি কি বল্? জিগ্যেস করলো মেয়েটি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ইম্‌লী সজল চোখ তুলে তাকালো। খানা—চাই না বহিন্, একটু ইম্‌লী দাও। উল্টে আসছে বড়ো। তারপর শরমনরম হাসি হেসে চোখ লুকিয়ে বললে, বাচ্চা ইম্‌লী চাইছে একটু।

—ও হরি, তাই বল্। প্রথমটা চমকে উঠেই চোখে মুখে বিরক্তি এনে চিৎকার করে উঠলো মেয়েটি।—বেরো বেরো। ওই মোড়ের

দোকানে চেয়ে নিবি যা। ও সব ফ্যাসাদ আছে আগে বললেই হতো। বেরো বেরো।

এক টান দিয়ে ইম্‌লীকে ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে ওর মুখের ওপরই দড়াম করে কপাটটা বন্ধ করে দিলো মেয়েটি।

পাশের ঘর থেকে কে বললে, তোর যেমন বুদ্ধি। ও তো ফুটপাথে হাজার গণ্ডা পড়ে আছে। রিফিউজি দেখে আনতে হয়।

হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ থেকে মোড়লদের বাকুড়ি পার হয়ে চিৎকার করতে করতে ঢুকলো দলটা। কালোকুলো চেহারা, হাতে কপালে উল্কি, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। জন পনেরো পুরুষ, জন দশেক মেয়ে। মেয়েগুলোর চেহারাও দিব্যি জোয়ান, মুখে, চোখে রুক্ষতা, চোখের দৃষ্টি হিংস্র অথচ চঞ্চল। কিংবা চোখের তারা কটা-কটা বলেই হয়তো হিংস্র দেখায়।

পুরুষদের পরনে নেংটি, হাতে তীর-ধনুক।

জন পঁচিশেক মেয়ে-পুরুষের বিচিত্র দলটা গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এলো সমস্বরে চীৎকার করতে করতে। হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

তীর-ধনুক উঁচিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে আর আকাশ-ফাটানো চিৎকার: হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

তারপর গাঁয়ের ঘরগেরস্থালির কাছে এসে পৌঁছতেই মেয়েগুলো গলা ছেড়ে গান ধরে:

> বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো--
> ঘর-ঘরানী কল্যা কাঁঠার জিয়াইল গো—
> নাউ কুমড়া জিয়াইল গো—
> মাঠের বাগুন শাকপাতা গুড়কুমড়া জিয়াইল গো—
> মিঠা কুমড়া জিয়াইল গো—
> বাণ মার্, বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো—

দশটা পুরুষালী চেহারার জোয়ান মেয়ে গলা ছেড়ে গায়, আর

তারপরই দলকে দল ছুটে চলে তীর-ধনুক উঁচিয়ে ; চিৎকার করে ওঠে সমস্বরে ঃ হা-লা-লা-লা…

কোটালপাড়ার পাশ দিয়ে গাঁয়ে ঢুকতেই দলটা ভেঙে গেলো। ছোট ছোট দল হয়ে ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে।—বান্দর-মার আইল গো, বান্দর-মার। পঞ্চাৎ ডাকেন গো, পঞ্চাৎ। হাত টাকা নগদ লিবো, তিন জুড়া গামছা।

ঘরে ঘরে গিয়ে বলতে শুরু করে মেয়েগুলো। কেউ কেউ ঝোলা থেকে একটার পর একটা পুঁটলি বের করে।—চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম—লিবে গো? আসুন হবে খোঁকা বসবে, আসুন হবে নন্দাই বসবে, আসুন হবে মায় বহুত ঠাকুর পূজবে।

মেয়েগুলোর ঝোলা-ভর্তি চামড়া। বাঘ, হরিণ, ছাগল, বাঁদরের চামড়া। সাপের চামড়া, খরগোশের চামড়া।

—লোহার আছেন গো গাঁয়ে?

লোহার, অর্থাৎ কামার। থাকলে টেনে টেনে বলবে, চাম লিবে গো, হাপঁর হবে।

—মৃধা আছেন গো গাঁয়ে, মৃধা? সুর টেনে টেনে জিগ্যেস করে।

মৃধা, অর্থাৎ চামার আর মুচি। তারাই হলো সেরা খদ্দের বাঁদর-মারাদের। কিন্তু আসল কাজ গাঁ থেকে বাঁদর তাড়ানো, বাঁদর মেরে সাফ করা। তার জন্যে চাই সাত টাকা নগদ আর তিন জোড়া গামছা। দেবে গাঁয়ের লোক একজোট হয়ে

দূর থেকে ওদের ওই চিৎকার শুনলেই বোঝা যায় বাঁদর-মারা আসছে। কিন্তু তার আগেই কি করে যেন টের পেয়ে যায় বাঁদরগুলো। বোধ হয় গায়ের গন্ধে। মাঠের আলে বাঁদর-মারার দল পা দিয়েছে কি না দিয়েছে, প্রাণপণে পালাতে শুরু করে। ইয়া ইয়া তাগড়াই

গতর নিয়ে যে বাঁদরগুলো সরে বসতে চায় না, বউ-ঝিদের পথ আগলে দাঁত খিঁচোয়, সেগুলো বাঁদরমারার গন্ধ পেয়ে দিক্‌বিদিকে ছুটতে শুরু করে দেয়। কেউ গাঁ ছেড়ে যায়, কেউ বট-অশ্বত্থের মাথায় বসে কাঁপে থরথর করে।

বাঁদর তো নয়, রাক্ষুসে হনুমান। হুটোপুটি করে দলে দলে লাফিয়ে পালাতে শুরু করলো হঠাৎ। রুগ্ন অসুস্থ বাঁদরগুলো বোধহয় বট-অশ্বত্থের ঘন পাতার আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলো। আর মা বাঁদরগুলোও। তাদের পেটে বাচ্চা।

গাঁয়ের লোক তখনো হা-লা-লা-লা চিৎকার শোনে নি। হুটোপুটি ছুটোছুটি দেখেই একটু বিস্মিত হয়েছিলো। ভেবেছিলো, কোন একটাকে হয়তো লতায় কেটেছে। লতায় অর্থাৎ সাপে। সাপে কাটলেও এমনি চিঁ চিঁ করে, ছুটোছুটি করে, গাছের শাখায় বসে থরথর করে কাঁপে সবাই। শুধু দু'চারটে ধাড়ি বাঁদর কি একটা নাম-না-জানা গাছের পাতা নিয়ে এসে দু' হাতে ঘষে ঘষে লাগিয়ে দেয় কাটা জায়গায়, মুখের ফাঁকে গুঁজে দেয়। তবু কেউ মরে, কেউ আধ ঘণ্টা চিঁ চিঁ করে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, লাফাতে লাফাতে পালায়। গাঁয়ের লোক তাই প্রথমটা ভেবেছিলো এমনি কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁদরমারাদের চিৎকার আর গান ভেসে আসতেই বুঝলো ব্যাপারটা।

কিছুদিন ধরেই জল্পনাকল্পনা চলছিলো শাঁখাভাঙার লোকেদের মধ্যে। পঞ্চে মোড়ল দেড় বিঘে জমিতে বেগুনের চারা বসিয়েছিল, বেশ একটু ডাগর হয়েছিলো চারাগুলো, তারপর একদিন দেখলে সব ছত্রাকার করে দিয়ে গেছে। শাক-সব্জি করতে দেবে না, লাউ-কুমড়ো হতে দেবে না, আখের ক্ষেতে ঢুকে মটমট করে ভেঙে দিয়ে যাবে সব। শুধু কি তাই, কারো উঠোন থেকে কাপড় নিয়ে পালাবে, বারান্দায় বড়ি শুকোতে দিলে ঘেঁটে দিয়ে যাবে, গাড়ুটা-হাঁড়িটা এর বাড়ী থেকে

নিয়ে গিয়ে ওর বাড়ীতে ফেলে দেবে। ভয় ডর নেই এতটুকু। পথে মেয়ে-বউ দেখলেই তাড়া করে। ছোট ছেলেপিলে সামনে গেলেই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে আসে।

শাঁখাভাঙার বামুন-কায়েত ডোম-বাগদী সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলো। দিনরাত বিব্রত আর বিরক্ত করে মারছে!

পঞ্চে মোড়ল তাই বলেছিলো, বাঁদর-মারাই আনতে হবে, জঙ্গল পানে একটা লোক পাঠান চাটুজ্জ্যে মশাই।

চাটুজ্জ্যে কোটালদের রিদেকে ডেকে বলেছিলেন, তাই বাঁদর-মারারই খোঁজ কররে রিদে। তোদের কোটালপাড়ায় এত লোক, তবু তোরা তো পারবি না।

হৃদয় কোটাল হেসে বলেছিল, ও কোনো লাভ নেই বামুনমশাই। ওরা এলে পালাবে, দু' একটা মরবে, তারপর দুটো বছর যেতে না যেতে আবার এসে ঢুকবে সব। বাঁদরগুলোই বা করবে কি কত্তা, এ গাঁয়ে বাঁদর-মারা এলে ও গাঁয়ে পালায়, ও গাঁয়ে বাঁদর-মারা এলে নচ্ছারগুলো এ গাঁয়ে ঢোকে।

হৃদয় কোটালের কথায় সায় দিয়েছিলেন অকলঙ্ক ভট্চায। পঁচিশটা গাঁয়ের গুরুবংশ। ধবধবে ফর্সা, দীর্ঘ ঋজু চেহারা, লাল টকটকে একখানা রেশমের কাপড় পরে সকাল সন্ধ্যা কালীপূজো করেন, 'কারণ' পানের জন্যেই চোখ জবার মত লাল। পায়ের খড়ম ঠকঠক করে ঘুরে বেড়ান এই বৃদ্ধ বয়সেও।

বাঁদর মারায় তাঁর ঘোর আপত্তি। প্রতিবাদ করেছেন বহুবার, কেউ শোনে নি।

তবু প্রতিবাদ করতে তিনি ছাড়েন না। এবারও বললেন, ওরা বানর নয় চাটুজ্জ্যে, ওরা বানর নয়, অভিশপ্ত মানুষ। রামচন্দ্রের অনুচর ওরা, শক্তির সাথী। বানর হত্যাও যা নরহত্যাও তাই।

প্রথম প্রথম অনেকে অবশ্য কান দিতো, গাঁয়ের মেয়ে-বৌরা

অকলঙ্ক ভট্‌চাযের পক্ষ নিতো। কিন্তু দিনে দিনে বাঁদরগুলোর সাহস আর অত্যাচারও যেমন বেড়েছে, তেমনি দিনকালও গেছে বদলে। বাঁদর-মারার বিরুদ্ধে ও-সব কুসংস্কার দূর হয়ে গেছে। তাই এবার আর কেউই কান দিলো না তাঁর কথায়।

পঞ্চে মোড়ল তাঁর কথার জবাবে হাঁচির মত করে এমনভাবে হ্যাঁঃ বলে উঠলো যে, অকলঙ্ক ভট্‌চায একটু অপমানিতই বোধ করলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত শিবকালী ভট্‌চাযের বংশে তাঁর জন্ম, এ তল্লাটের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের শতকরা আশিটা লোক তাঁর কাছে মন্ত্র নিতে পেলে ভাগ্যবান মনে করে, আর কালের হাওয়ায় তাকেও কিনা অশ্রদ্ধা করছে পঞ্চে মোড়ল! রাগে অভিমানে ঠক ঠক করে খড়ম বাজিয়ে চলে গেলেন তিনি।

আর সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় কোটাল হাত পাতলে মোড়ল আর চাটুজ্জ্যে মশাইয়ের কাছে। চিড়ে-গুড় আর যাতায়াতির খরচ বাবদ একটি টাকা তার পাওনা।

টাকাটি নিয়ে পেটকাপড়ে গুঁজে রেখেছিলো রিদে কোটাল, বলেছিলো, পরশু ভোর নাগাদ যাবো আজ্ঞে। মঙ্গলের ঊষা বুধে পা যথা ইচ্ছে তথা যা। শুভকাজ তো বামুনমশাই, বুধবারকে কাক পাখি ডাকতে না ডাকতে বেরিয়ে পড়বো।

কিন্তু বেরুতে হলো না হৃদয় কোটালকে। পরের দিন বিকেলেই গাঁয়ের দক্ষিণ কোণ থেকে চিৎকার ভেসে এলো।—হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার।

এ চিৎকার সবাই চেনে। ঘরে ঘরে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। যাক এবার কিছুদিনের জন্যে বাঁদর নিশ্চিহ্ন হবে গ্রাম থেকে। বাঁদরমারার দল এসেছে, বাঁদরমারার দল।

দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়লো দলটা।

মেয়েগুলো গান শুরু করে থেকে থেকে, আর গানের শেষে সুর

করে টেনে টেনে বলে, বান্দর-মার আইল গো, বান্দর-মার। পঞ্চাৎ ডাকোন গো, পঞ্চাৎ। হাত টাকা নগদ লিবো, তিন জুড়া গামছা।

গাঁ-সুদ্ধ লোক এসে জড়ো হলো তাদের ডাকে। পঞ্চে মোড়ল, চাটুজ্জ্যে, হৃদয় কোটাল।

চাটুজ্জ্যে বললে, সাত টাকা নগদ পাবি, কিন্তু গামছা দুজোড়া।

—উঃ ভিখ মাগোন আইলাম গো। বলে মুখের ওপর একটা ঝামটা দিয়ে ফিরে দাঁড়ালো টিকালী।

আঠারো-বিশ বছরের একটা আঁটসাঁট রুক্ষ যৌবন, চোখ-মুখে কেমন একটা হিংস্র রহস্যের ভাব, কটা-কটা চোখে কুটিল তীব্রতা। মেয়েটা এক ঝটকায় ফিরে দাঁড়াতেই তার দুহাতে দোলানো হরিণের চামড়াটা সপাং করে এসে লাগলো রিদে কোটালের গায়ে।

গাঁ-সুদ্ধ লোকের সামনে বাঁদরমারা দলের মেয়েটা কিনা ছুঁয়ে দিলো তাকে! রেগে টং হয়ে চামড়াটা কেড়ে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল রিদে কোটাল, কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটার শরীরের দিকে চোখ পড়েছে তার। আর চোখ পড়তেই থমকে থেমে গেলো হৃদয়।

রুক্ষ রুক্ষ চেহারার নোংরা এই বাঁদর-মারার দলে এমন একটা মেয়ে আছে এতক্ষণ বুঝি লক্ষ্যই করে নি রিদে কোটাল।

টিকালীও প্রথমটা ঠাহর করতে পারে নি কি ঘটলো। কেন তার হাতের চামড়া কেড়ে নিলো লোকটা। কিন্তু বোকা বোকা ভাবে তার দিকে সে তাকিয়ে আছে দেখে ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দিলো সে রিদে কোটালের গালে। আর সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোক হো হো করে হেসে উঠলো।

চড় খেয়েও কিন্তু কিছু বললে না রিদে কোটাল। শুধু চামড়াটা ছুঁড়ে দিলো টিকালীর কাঁধের ওপর।

পঞ্চে মোড়ল হাওয়াটা হাল্কা করার জন্যে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাঁদর তাড়া তো আগে।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে চিৎকারে ফেটে পড়লো দলের মেয়ে-পুরুষ সবাই। সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো: হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা, হা-লা-লা-লা।

তারপরই সুর টেনে টেনে গাইতে শুরু করলো মেয়ের দলটা:
বাণ মার্ বাণ রাম বান্দর-মার আইল গো—

গাঁয়ের এক প্রান্তে একটা বকুল গাছের তলায় গিয়ে ডেরা বাঁধলে বাঁদর-মারার দল। কাঠকাঠি যোগাড় করে আনলে মেয়েগুলো, পুরুষগুলো বেরিয়ে পড়লো মেঠো ইঁদুর, জলা ব্যাং কিংবা খাটাশ খরগোশের খোঁজে।

মেয়েদের ঝোলা থেকে বের হলো জোয়ারের দানা, মেটে হাঁড়ি, কয়েকটা সরা।

রাত করে ফিরলো পুরুষগুলো। কারো হাতে একটা মোটাসোটা ইঁদুর, কারো হাতে খাটাশ। কাঠকাঠির আগুন তখন গনগন করে জ্বলছে, মাটির সরাগুলো উল্টে নিয়ে জোয়ারের রুটি সেঁকছে মেয়েগুলো।

পুরুষগুলো শিকার করে ফিরতেই সরা নামিয়ে নিলো সবাই, ইঁদুর আর খাটাশগুলো গুঁজে দিলো গনগনে আগুনে।

তারপর ফুর্তিতে কলকল করে উঠলো একসঙ্গে। কাজও মিলেছে এ-গাঁয়ে, শিকারও মিলেছে। এখন দিন কয়েকের জন্যে নিশ্চিন্ত। রচ্চন আর টিকালীও।

টিকালী কিন্তু আসলে ভুলভুলিয়াদের মেয়ে। বাপ তার ভালুক পোষ মানায়, সে পারবে না মানুষ পোষ মানাতে! রচ্চন রোজাকে দেখে অবশ্য মনে হবে না পোষ মেনেছে সে। কাঁধ অবধি ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল জট পাকিয়ে আছে। একটা লাল কাঠের কাঁকুই দিয়ে আঁটা। নাকটা থ্যাবড়া, চওড়া চৌকো মুখ, হনুর হাড় উঠে আছে,

চোখ দুটো হিংস্র আর ভয়ঙ্কর। যেমন রুক্ষ চেহারা তেমনি দস্যুর মত স্বাস্থ্য। দিনরাত যেন রেগে টং হয়ে আছে এমনি লাল লাল চোখ। কিন্তু টিকালীর কাছে এসে যখন বসে রচ্চন, গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দলের সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতে টিকালীর দিকে তাকায় ফিরে ফিরে, তখন আপনা থেকেই যেন তার রুক্ষ শরীরটার ওপর একটা কোমল স্নিগ্ধতা নেমে আসে।

সত্যি, বাঁদর-মারার দলে দশটা মেয়ে, কিন্তু টিকালীর মতো একটাও নয়। না চেহারায়, না কাজে। ওর মতো জোয়ারের রুটি বানাতে পারে না কেউ, পারে না এমনভাবে শিকারের মাংস 'ঝামরে' দিতে, কিংবা তাড়িয়া মদ বানাতে।

শিকার থেকে ফিরে এসে কাঠকাঠির গনগনে আগুন ঘিরে বকুল গাছটার তলায় ডেরা ফেলেছে দলটা। গল্পগুজব করছে সবাই। সাতটা টাকা পাওয়া যাবে এ-গাঁয়ে, আর তিন জোড়া গামছা। কে কে পাবে গামছাগুলো, গত বছর কে কে পায় নি, তার হিসেবনিকেশ ভাগবাঁটোয়ারা হচ্ছিলো। ভাগবাঁটোয়ারার কথায় মাঝে মাঝে তেতে উঠছিলো দু'চারজন, চেঁচিয়ে উঠছিলো। ঝগড়া হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই মিটিয়ে দিচ্ছিলো বুড়োগুলো! কিন্তু হিসেব-নিকেশের যেন আর মীমাংসা নেই। সাত টাকার মধ্যে কত খরচ হবে জোয়ার কিনতে, নুন কিনতে, আর কত পয়সার হাঁড়িয়া!

যত রাত হয়, কলহ-কোলাহল ততই বাড়ে। তারপর একসময় মেয়েগুলো গুনগুন করে গান ধরে আগুনের মধ্যে শিকামের মাংস ঝলসাতে ঝলসাতে। দশটা মেয়ের গুনগুননিতে চাপা পড়ে যায় সব কাজিয়া ঝগড়া, পুরুষগুলো ক্লান্ত হয়ে চুপ করে এক সময়।

তারপর খেয়েদেয়ে হাঁড়িয়ায় চুমুক দিয়ে গাছতলাতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়ে সকলে।

ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে বাঁদর-মারার দল। হাতে তীরধনুক।

ছোট ছোট চারটে দল হয়ে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে শাঁখাভাঙার চৌহদ্দি। তারপর সমস্বরে একবার করে চিৎকার করে ওঠেঃ হা-লা-লা-লা বান্দর-মার, হা-লা-লা-লা বান্দর-মার! আর ছুটে ছুটে আসে কোন একটা বাঁদরকে পালাতে দেখলেই। পুকুরের পাড়, গাছের শাখা, বাড়ির ছাদ—যেখানেই লুকোবার চেষ্টা করুক না কেন, বাঁদর-মারার হাত থেকে নিস্তার নেই।

লারী, টিকালী আর রচ্চনরা সাতটা লোক নিয়ে একটা দল। ভোর হতেই ওরা এসে ঢুকলো গাঁয়ের মধ্যে। চারপাশ থেকে তাড়া খেয়ে মাঠের গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে বাঁদরগুলো এসে জোটে গাঁয়ের মধ্যে। কারো টিনের ছাদের কার্নিশে, কারো খড়-পালুইয়ের আড়ালে লুকোয়। সবচেয়ে বিপদ যেগুলোর বুকে-কোলে ছোট ছোট বাচ্চা।

টিকালীদের ছোট দলটার চিৎকার শুনেই গাঁয়ের লোক, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো এসে জুটলো। পঞ্চে মোড়ল, চাটুজ্জ্যে, রিদে কোটাল।

· টিকালীর রুক্ষ হাতে একটা চড় খেয়েছে রিদে কোটাল, কিন্তু তার জন্যে আর কোন রাগ নেই তার। ও শুধু দেখছিলো দলটার কারসাজি। কেমন আন্দাজে আন্দাজে লুকোনো বাঁদরগুলোকে খুঁজে বের করছে ওরা। আর তারপরই তাড়া দিচ্ছে।

ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য টিকালীর সঙ্গে চোখোচোখি হয় রিদে কোটালের।

হাসে টিকালী, চোখ ঠারে, তারপরই বাঁদর-মারার নেশায় হঠাৎ যেন ভুলে যায় রিদে কোটালকে।

রিদে কোটাল কিন্তু ভোলে না। ওর চোখ শুধু টিকালীর দিকে, টিকালীর উগ্র যৌবনের লোভানির দিকে। একটু আড়াল খোঁজে রিদে, একটু আড়ালে পেলেই দুটো রসিকতার কথা বলে দেখতো সে।

টিকালী আর রচ্চন ও-সব বোঝে না দেখেও দেখে না। ওদের চোখ তখন পঞ্চে মোড়লের মড়াইতলায়। একটা বাচ্চা বুকে নিয়ে ধাড়িটা লুকিয়েছে আমগাছটায়। থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু ওখান থেকে ওকে তাড়িয়ে আনতে পারছে না ওরা কিছুতেই। অথচ তাড়িয়ে না আনলেও চলবে না। গৃহস্থ ঘরের আঙিনায় তো বাঁদরের রক্ত পড়তে দিতে পারে না। তাড়িয়ে তাকে মাঠের দিকে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তীর ছুঁড়ে মারবে।

বারকয়েক হা-লা-লা-লা চিৎকার ছুঁড়লো রচ্চনের দল। কিন্তু বাঁদরটা নড়লো না।

শুধু চিৎকার শুনে বেরিয়ে এলেন অকলঙ্ক ভট্চায। খড়ম ঠকঠক করে এসে দাঁড়ালেন পঞ্চে মোড়লের আঙিনায়। আমগাছের ডালের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আহা, ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ভয়ে কাঁপছে মা। চিঁ চিঁ করছে বাচ্চা বাঁদরটা।

অকলঙ্ক ভট্চায এগিয়ে এলেন, চাটুজ্জ্যে আর পঞ্চে মোড়লের উদ্দেশে বললেন, আহা, অমন করে হত্যা করো না ওদের। বানর নয় হে ওরা, মানুষ। অভিশপ্ত মানুষ ওরা। দেখছো না, মানুষের মতো কেমন বুকে জড়িয়ে রেখেছে ছেলেটিকে।

পঞ্চে মোড়ল আর চাটুজ্জ্যে হাসলো মুখ টিপে। পণ্ডিত শিবকালী ভট্চাযের বংশে জন্ম হলে কি হবে, ভট্চায মশাই নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছেন। বাঁদর কিনা মানুষ! মানুষের মতো!

রিদে কোটালও হেসে বললে, মানুষের মতন বটে, কিন্তু মানুষ লয় গুরুমশাই! গাছের ফলটা আশটা খায়, বলি ক্ষিদের লেগে খায়। মোড়লমশায়ের বেগুনের চারা নষ্ট করে কেন? কাপড় লিয়ে পালায় কেন? বউ-ঝিদের বেইজ্জত করে কেন পথে-ঘাটে! সাধে কি আর বাঁদর কয় মশাই।

রচ্চন আর টিকালীর ও-সব দিকে চোখ-কান নেই। ওরা মাঝে

মাঝে চিৎকার করে ওঠে হা-লা-লা-লা করে, আর বাঁদরটাকে ভয় দেখানোর জন্যে তীর ছোঁড়ে। এমন ভাবে ছোঁড়ে যাতে গায়ে না লাগে, অথচ ভয় পায়।

ধাড়ী মা-বাঁদরটা ভয়ে ভয়ে নড়েচড়ে বসছিলো এ-ডাল থেকে ও-ডালে। আর নড়া-চড়া করতে গিয়েই একটা কাণ্ড ঘটে গেলো। মায়ের বুক আঁকড়ে লেপটে ছলো বাচ্চাটা, টুপ করে হঠাৎ নীচে পড়ে গেলো হাত ফসকে।

সে কী চিৎকার মা-বাঁদরটার! যেন আতঙ্কে কান্নায় ফেটে পড়লো!

রচ্চনের দলের একটা লোক ছুটে এসে তুলে নিলো বাচ্চাটাকে। তারপর পুকুরপাড় দিয়ে হাঁটতে শুরু করলে। বাচ্চাকে দূরে নিয়ে গেলে ও-জায়গা ছেড়ে আসতেই হবে মা-কে।

সত্যিই তাই, বাচ্চাটাকে নিয়ে লোকটা যত এগোয়, মা-বাঁদরটা ততই তার পিছনে পিছনে চলে এ-গাছ থেকে ও-গাছে লাফিয়ে লাফিয়ে।

রচ্চনদের সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের লোকও ভিড় করে চলে। চাটুজ্জ্যে, পঞ্চে মোড়ল, রিদে কোটাল। যেন কত বড় একটা তামাশা হচ্ছে।

অকলঙ্ক ভট্চাযও পিছনে পিছনে চলেন খড়ম ঠকঠক করে, আর বারবার বলেন, আহা ওকে ছেড়ে দাও, ওইটুকু এক রত্তি শিশু, নিষ্পাপ নির্বোধ মানবসন্তান, ওকে তোমরা মুক্তি দাও।

কে শোনে তাঁর কথা।

পঞ্চে মোড়লের বেগুনের হলহলে চারাগুলি বাঁচাতে হবে, আখের ক্ষেত বাঁচাতে হবে, তরিতরকারির বাগান বাঁচাতে হবে।

অকলঙ্ক ভট্চায আবার কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ধাড়ীটাকে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে গাঁয়ের লোক দূরে পালালো। অকলঙ্ক ভট্চায নিজেও একটু ভড়কে গেলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই দেখলেন, ধাড়ীটা ছুটে এসে বসলো তাঁর সামনে, ঠিক মানুষের মত ছুটি হাত জোড় করে ছুটি করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো। কিচকিচ করে কি যেন বলতে চাইলো বাঁদরটা। কিন্তু তার আগেই বাঁদরমারাদের একটা তীর এসে লাগলো ধাড়ীটার বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেই ছটফট করতে শুরু করলো বাঁদরটা। তারপর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। রক্তে ভিজে গেলো অকলঙ্ক ভট্চাযের পায়ের তলার মাটি।

ছু' চোখ বেয়ে জল নামলো তার। কাউকে কোন কথা না বলে খড়ম ঠকঠক করে বাড়ির পথ ধরলেন তিনি। এতদিন ধরে মন্ত্রই দিয়ে এসেছেন পাঁচটা গাঁয়ের মানুষগুলোকে, মন দিতে পারেন নি।

অদ্ভুত একটা জ্বালা নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি।

দিনের পর দিন সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সারা গাঁ টহল দিয়ে বেড়ায় বাঁদর-মারার দল। মাঝে মাঝে হা-লা-লা-লা চিৎকার করে ওঠে, ক্যানেস্তারা বাজায়, আর তীর ছোঁড়ে।

এমনিতেই বাঁদর-মারা এসেছে টের পেয়ে পালিয়েছিলো সব, যা ছু দশটা এদিক ওদিক ছিটকে লুকিয়ে ছিলো সেগুলোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই মেরে শেষ করলো। তীর মেরেই কাজ শেষ নয়, মরা বাঁদর-গুলোকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাঙ করেছে বকুলতলায়, চাম ছাড়িয়ে রোদে শুকিয়েছে, ঝোলায় ভরেছে। তারপর ডোম আর মুচি-মৃধাদের পাড়ায় গিয়ে হাঁক ধরেছে মেয়েগুলো ; চাম লিবে গো, চাম। বাঘের চাম, হরণের চাম, ছাগের চাম, বান্দরের চাম—লিবে গো। হাঁপর হবে, আস্থন হবে।

আর বামুন কায়েতদের ঘরে ঘরে গিয়ে বলেছে, ভালুকের লোম লিবে গো, ভালুকের লোম। ঘুনসিতে বাঁধবে, জ্বর ছাড়বে। গলায় বাঁধবে, জ্বর ছাড়বে। ভালুকের লোম লিবে গো!

ভুলভুলিয়াদের কাছ থেকে ভালুকের লোম নিয়ে আসে তারা, ছাগের চাম, বাঘের চাম নিয়ে আসে, আর আনে সাপের বিষ, কাঁকড়া বিছের তাগা, দু' পাঁচটা জরিবুটি। গান গেয়ে গেয়ে বিক্রি করে।

বায়না মতো কাজ শেষ হতেই মেয়েগুলো বেরিয়ে পড়লো ঘরে ঘরে সে-সব বেচে আসতে।

টিকালী আর রচ্চন আর লারী এসে বসলো পঞ্চে মোড়লের মড়াইতলায়। গড় হয়ে পেন্নাম করলে বাংলাবাড়ীর উঁচু উঠোনটার উদ্দেশে, যেখানে পঞ্চে মোড়ল, চাটুজ্জ্যে, গাঁয়ের আর পাঁচটা লোক বসে তামাক টানছিলো, তাস পেটাচ্ছিলো।

রিদে কোটাল বসেছিলো উঠোনের একটেরে, থামে ঠেস দিয়ে।

সেদিকে তাকিয়ে চোখ ঠেরে হাসলো টিকালী। বোধ হয় সেদিনকার চড় মারার কথাটা মনে পড়তেই। একটু মায়াও হলো যেন। আহা, অমন জোয়ান মানুষটাকে চড় মারলো সে, তবু কিচ্ছু বললো না? মানুষটা লরম বটে। মনটা লরম ওর!

রচ্চনের ও-সব দিকে চোখ-কান নেই। এসে নীচের উঠোনে ধান-ঝাড়াইয়ের পাটাটার পাশে বসলো। গড় হয়ে পেন্নাম করলে: দেন গো মশাইরা, আমাদিগের ছুত্যির টাকাটা দিয়া দেন।

টিকালী ধুয়ো ধরলে: হাঁ গো, হাত টাকা নগদ লিবো, আর তিন জুড়া গামছা।

পঞ্চে মোড়ল ধমক দিয়ে উঠলো।—হ্যাঁ, তা দেবো না! চুক্তি ছিল তাই?

রচ্চন চোখ কপালে তুললো।—হাঁ গো মশাইরা।

পঞ্চে মোড়ল বললে, সাত টাকা নগদ দেবো বলেছিলাম, গামছা তো দু জোড়া।

—না মশাইবাবু, তিন জুড়া গামছা। টিকালী দাঁড়িয়ে উঠলো, তারপর রিদে কোটালকে দেখিয়ে বললে, শুধাও কেনা ওই মানুষটারে।

রিদে কোটাল বিব্রত হলো।

বাবুরা যা বলছে, বামুন মশাই যা সায় দিচ্ছে, তার বিরুদ্ধে ও কি বলবে। ছ' জোড়া গামছার কথা হয়েছিলো বটে, কিন্তু রাজি হয় নি বাঁদর-মারার দল। তিন জোড়া গামছাই ওদের পাওনা।

চাটুজ্জ্যে বললে, যা দিচ্ছি নিয়ে যা, আর ঝামেলা করিস না।

টিকালী সজোরে মাথা নাড়লে।—না গো মশাইরা, উ মানুষটাকে মাঝস্থ করছি। উ বলুক কেনা।

বলে ছুটো কপিশ ক্রূর চোখ যথাসম্ভব করুণ করে টিকালী তাকালো রিদে কোটালের দিকে।

পঞ্চে মোড়ল হাসলো।—ভালো সাক্ষী জুটিয়েছিস তো। বল্ রে রিদে কি চুক্তি হয়েছিলো ?

রিদে কোটাল বিব্রত হলো। তবু বাবুদের মন রাখবার জন্যে বললে, ছু'জোড়াই তো বলেছিলেন আজ্ঞে।

পঞ্চে মোড়ল বললে, ওই দেখ, ওই ছু'জোড়াই দেবো, কাল এসে নিয়ে যাস।

টিকালী একবার তাকালে মোড়লের দিকে, একবার রিদের দিকে, তারপর হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো।

বললে, মানুষ লও তুমরা।

অসন্তুষ্ট ক্রুদ্ধ মন নিয়ে ফিরে গেলো টিকালী আর রচ্চন আর লারী। কাল সকালেই আবার আসবে ওরা দলের সবাইকে নিয়ে।

কিন্তু পরের দিন সকালে আর আসা হলো না। হাঁড়িয়া খেয়ে সারা রাত নাচগান করে ভোম হয়ে ঘুম দিলো সব এক প্রহর বেলা অবধি। খোয়ারি ভাঙলো না। নেশায় গড়ালো শুধু।

নেশার ঘোরে টিকালীর বারবার মনে পড়ছিলো শুধু রিদে কোটালের চেহারাটা। কী মজবুত চেহারা মানুষটার, ইয়া চওড়া কাঁধ, শক্ত ছু'খানা হাত। টিকালী বুঝেছে, ওর ওপর লোভ পড়েছে মানুষটার।

আর টিকালীর নিজেরও মায়া পড়েছে তার ওপর। আহা, মিছেমিছি লোকটার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলো ও। পরক্ষণেই মনে হলো, ভালোই করেছে। মিছে কথা বললে লোকটা, টিকালীর কথার মান রাখলো না ? বলে কিনা দু'জোড়ার চুক্তি হয়েছিলো ?

কিন্তু তিনজোড়া গামছা না পেলে যে ওদের ভাগবাঁটরা সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। না, মশাইবাবুরা তিন জুড়াই দিবে, দিবে। রিদে কোটালকে আবার শুধালে ও নিচ্চয় বলবে তিন জুড়া দিবার ছুত্তি ছিল।

তবু লোকটার সাথে টুকুন হাসাহাসি কথা বলতে হবে। কি জানি, লোকটা রাগ করেছে হয়তো। ওকে খুশী করলে তিন জোড়া গামছাই মিলবে।

নেশায় ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে তাকালো টিকালী। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। না, মেয়ে পুরুষ সব লুটিয়ে আছে। খোয়ারী ভাঙে নি রচ্চনেরও।

একা একাই উঠে পড়লো টিকালী। কোমর থেকে খসে-পড়া ছেঁড়া নোংরা কাপড়টা আঁট করে বাঁধলে কাঁপা কাঁপা হাতে। নেশার ঘোর কাটে নি তখনো। টলতে টলতে গাঁয়ের পথ ধরলে।

গাঁ অবধি আসতে হলো না। মাঝ মাঠে আমবাগানে ঘেরা সাঁইপুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে টিকালী দেখলে একটা লোক বসে রয়েছে পুকুরপাড়ে। কে বটে ? এগিয়ে গেল টিকালী। সারি সারি গাছের গুঁড়িতে ঢাকা পড়লেও বোঝা যাচ্ছে একটা পুরুষ মানুষ।

আরে রিদে কোটালই তো! ছিপ ফেলে বসে আছে। মাছ ধরছে এক মনে।

টলতে টলতে এলো টিকালী, তবু পা টিপে টিপে। শুকনো পাতায় পা পড়ে না মড়মড় শব্দ হয়। রিদে কোটাল না সজাগ হয়।

ধীরে ধীরে এসে পিছনের একটা গুঁড়ির আড়ালে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ফাতনার দিকে চোখ রেখে বসে ছিলো রিদে কোটাল। আর তার পুরুষ্টু কাঁধ আর চওড়া পিঠের ওপর মোহময় চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিলো টিকালী।

ফাতনায় টান পড়তেই সপাং করে ছিপে টান দিলো রিদে কোটাল।

কিন্তু মাছ উঠলো না, শুধু টোপটা খেয়ে পালিয়েছে মাছটা।

আবার বঁড়শিতে কেঁচো গেঁথে ছিপ ফেললো হৃদয়।

খানিক পরেই ফাতনায় টান পড়লো, আবার সপাং করে ছিপ টানলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠলো টিকালী।

চমকে ফিরে তাকালো হৃদয়। দেখে চমকে উঠলো। সারা শরীর যেন তার সিরসির করে উঠলো মেয়েটার দিকে তাকিয়ে। তুলে তুলে কেঁপে কেঁপে হাসছে মেয়েটা, নেশার হাসি। হাসছে আর কাঁপছে তার শরীরের মাংসল ঢেউগুলো। কাঁপছে না, যেন নাচছে থরথর করে।

হাসতে হাসতেই টিকালী বললে, ডাঁড়ে শিকার লাগলো নাই ?

রিদে কোটাল ততক্ষণে ছিপটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টিকালীর খিলখিল হাসি দেখে আর তার উদ্ধত যৌবনের থরথরানি দেখে হৃদয় কোটালের মনেও তখন নেশা ধরেছে।

তুটো ভারী পা ফেলে এগিয়ে এলো সে। এগিয়ে এসে মোহ-গ্রস্তের মত তাকিয়ে থাকতে থাকতে টিকালীর একখানা হাত ধরলে খপ্ করে, ধরলে শক্ত মুঠোয়।

হাতটা ছাড়াবার জন্যে তুটো হেঁচকা টান দিলে টিকালী। পারলে না।

হাতটা ছাড়াতে না পেরেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। সারা শরীর তার নেচে নেচে উঠলো।

তারপর তার হিংস্র আর কটা কটা চোখে রিদে কোটালের মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিলে সে। ফিসফিস করে বললে, চ উদিক পানে।

রোদ চড়তেই খোয়ারি ভাঙলো, একে একে উঠে বসলো বাঁদর-মারার দল। এ ওকে ঠেলে তুললো, ও একে ঠেলে তুললে। কুণ্ডলী পাকিয়ে সব একদলা কেঁচোর মত ঘুমিয়ে ছিলো, উঠে বসলো এক দলা গুবরে পোকার মতো।

আধা-নেশার চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে রচ্চন।

ঝলসানো মাংসের চিবোনো হাড়, নোংরা ঝোলাঝুলি, বাঁদরের চাম, মেটে হাঁড়ি আর সরা এখানে ওখানে ছড়ানো ছিটোনো। একে একে দলের সবারই মুখের ওপর লাল টকটকে চোখ জোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে গেলো রচ্চন। না, সবাই আছে, নেই শুধু টিকালী।

গেলো কোথায়? চোখ দুটো হঠাৎ তার হিংস্র হয়ে উঠলো, কপালের শিরাটা ফুলে উঠলো।

ক্ষ্যাপা গলায় রচ্চন চেঁচিয়ে উঠলো।—এ লারী! টিকালী কুথাকে?

তেজী সাপের মতো ঘাড় ফেরালো মেয়েটা।—তুর বহু তু জানিস। লেশা হয়েছে দেখে উ লিঘ্‌ঘাৎ উদের ঠেঙে টাকা আর গামছা লিয়ে পালাবে।

দলসুদ্ধ লোক হৈ হৈ করে চিৎকার করে উঠলো। উঠে দাঁড়ালো সবাই। পুরুষগুলো উঁচিয়ে ধরলো তীর আর ধনুক। মেয়েগুলোর হাতে চাম-ছাড়ানোর ধারালো ছুরি। সাত দিনের মজুরী তাদের : হাত

টাকা নগদ, তিন জুড়া গামছা। সারা গাঁয়ের বাঁদর তাড়িয়েছে, বাঁদর মেরে শেষ করেছে। আর ছুত্যির টাকা নিয়ে পালাবে টিকালী?

—ভুলভুলিয়া মেয়্যা, অমন তো হবেই। বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে নেড়ে বললে দলের বুড়া।

এক সারি ক্ষ্যাপা শূয়োরের মতো রাগে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে মশাইবাবুদের বাড়ির পথ ধরলো বাঁদর-মারার দল। টাকা আর গামছা নিয়ে পালিয়ে থাকে তো পাঁচ গাঁ ঘুরে খুঁজে বের করবে টিকালীকে। ছালতাই চাকু দিয়ে চাম ছাড়িয়ে লিবে টিকালীর। লুভী মেয়েটাকে ঠুসে দেবে কাঠকাটির আগুনে। ভুলভুলিয়ার মেয়্যা, বাঁদর-মারা চিনে না!

নানান জল্পনাকল্পনা, হৈ হট্টগোল আর গালাগালি দিতে দিতে আলপথ ধরে আসছিলো দলটা।

গাঁ যত কাছে আসছে রাগ তত বাড়ছে। রাগ যত বাড়ছে মুখের কথা তত কমছে।

শুধু একটা ঘোঁতঘোঁত শব্দ হয় নাকের। মুখে কথা নেই কারো। সারা শরীর যেন রাগে জ্বলছে সবার।

মাঠের আমবাগানে ঘেরা সাঁইপুকুরের পাশ দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ চমকে থেমে পড়লো দলটা। বাগানের ভিতরে কারা যেন কথা বলছে, হাসছে?

রচ্চন আর লারী এগিয়ে গেলো বাগানের দিকে।

আর পরমুহূর্তেই খিলখিল করে হেসে উঠলো লারী। দূরের ঝোপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে আবার হেসে উঠলো।

তীর-ধনুক উঁচিয়েই ছিলো রচ্চন। সাঁ করে তীরটা ছুঁড়ে দিলো সে রিদে কোটালকে লক্ষ্য করে।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলো হৃদয়, চিৎকার করে উঠেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

ছুটতে ছুটতে এলো রচ্চন। রচ্চন আর লারী। আর টিকালী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কাঁপছে থরথর করে।

ছুটে এলো রচ্চন। দেখলে রিদে কোটালের একটা হাত এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে তীরটা। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ছে। মাটি ভিজে গেছে রক্তে। গোঁ গোঁ করছে রিদে।

রচ্চন হিংস্র ক্রুর চোখে তাকালো রিদে কোটালের মুখের দিকে, তীরের ডগাটা মট করে ভেঙে দিয়ে তীরটা টেনে বের করলে।

তারপর অসীম ঘৃণার সঙ্গে মাটিতে এক দলা থুতু ফেলে বললে, বা-ন্-দ-র!

খিলখিল করে লারী হেসে উঠলো আবার। আর সঙ্গে সঙ্গে টিকালীর কটা কটা হিংস্র চোখ জোড়াও খিলখিল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বলে উঠলো: বা-ন্-দ-র।

চোর

বিয়ে-বাড়ির উচ্ছল হাওয়া হঠাৎ থমকে থেমে গেলো। জরি আর রেশমের বাতাসে হেলেদুলে হাসি হল্লায় মেতে ছিলো মেয়ের দল। এক মুহূর্তে আতঙ্কের মত স্তব্ধ হয়ে গেলো তারা। ফিসফিস করল পরস্পরে। কানাকানি করলো চাপা গলায়।—শান্নু ঘোষ এসেছে, শান্নু ঘোষ !

নামটাই আতঙ্কের। নাম শুনে শঙ্কিত হতে হয় যতখানি, ঘৃণাও ততখানি। শান্নু ঘোষ—জীবন ঘোষের ছেলে শান্নু ঘোষ।

জীবন ঘোষ অবশ্য সে-কথা শুনলে রেগে যায়। বলে, ও একটা কলঙ্ক, বংশের কলঙ্ক, জাতের কলঙ্ক। ও আমার ছেলে নয়, আমার ছেলে বলে পরিচয় দিয়ো না ওর।

কথাটা মিথ্যে নয়, এমন ছেলের পরিচয় দিতে বাপেরও লজ্জা। বিশেষ করে জীবন ঘোষের মত সম্মানীয় ব্যক্তির। জীবন ঘোষকে শ্রদ্ধা করে না, সম্মান করে না এমন মানুষ এ তল্লাটে নেই বললেও হয়। অথচ তারই ছেলে শান্নু—শান্ত কি করে যে এমন হলো কেউ বুঝতে পারে না। ধর্মের পথ থেকে, ন্যায়ের পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি জীবন ঘোষ, বিচ্যুত হন না। ছেলেকে শাসন করতেও কসুর করেন নি কোনোদিন। এমন কি সেই সাত বছর বয়সে যখন শান্নু ঘোষের মা মারা গেলো তখনও অন্যায় আদর দেন নি তিনি। শাসন করেছেন, প্রহার দিয়েছেন, ছেলেকে শুধরে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শান্নু তার অভ্যাস ছাড়ে নি। ছাড়তে পারে নি। অভাব নেই, দারিদ্র্য নেই, তবু শান্নু ঘোষের হাতটা অকারণে যেন নিশপিশ করে ওঠে। একটা কিছু চুরি না করে যেন একটা দিনও চলে না তার।

এমন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম, অথচ শানু ঘোষ তার কোন দাম দেয় না। দেয় নি। সেই ছোঁটবেলা থেকেই এক অবোধ্য নেশার হাত থেকে কিছুতেই যেন নিজেকে সরিয়ে আনতে পারে নি।

প্রথম প্রথম মা-মরা ছেলেটা যখন এর বাড়ির গাছ থেকে নারকেল, ওর বাড়ির গাছ থেকে পেয়ারা চুরি করতো তখন কেউই ভাবে নি ছেলেটা সত্যি সত্যিই চোর হয়ে দাঁড়াবে। ছোটবেলায় এমন তো সবাই করে। তা বলে বড় হয়েও অভ্যাসটা যাবে না?

শানু ঘোষের ওটা তো অভ্যাস নয়, রোগ।

জীবনবাবু প্রথম প্রথম বলতেন, মারের চোটে ও রোগ সারিয়ে দেবো।

মারতেনও। বিশ বছর বয়স যখন শানুর, একদিন দড়ি দিয়ে বেঁধে জানলার একটা আলগা শিখ খুলে নিয়ে দমাদ্দম পিটিয়ে ছিলেন। কি হলো তাতে! দুদিন পরেই তো অভিযোগ এলো, ঘড়ির দোকানটা থেকে একটা টাইম-পীস চুরি করে পালিয়েছে শানু।

এমন তো কতবারই হয়েছে। কখনো কারও বাড়ি থেকে, কখনো দোকান থেকে। টাকা দিয়ে মুখ চাপা দিয়েছেন জীবনবাবু। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে সরাসরি বলেছেন, ওর দায়দায়িত্ব আমার নয়, ও ছেলে আমার নয়।

তবু জীবন ঘোষকে সবাই শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, তাই থানা পুলিশ করতে রাজি হয় নি কেউ। কখনই কারো কিছু চুরি গেছে, বুঝতে পেরেছে কে নিয়ে সরে পড়েছে, তখনই জীবন ঘোষের কাছে এসে বলেছে সে। আর শানু ঘোষই নিয়েছে কিনা জানা দুরূহ নয়। চুরি যাওয়ার খানিক আগে কি শানুকে দেখা গিয়েছিলো কাছেপিঠে? তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে বলা যায় কে নিয়েছে। ও শানু ছাড়া আর কারো কাজ নয়।

জীবনবাবু নিজে মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসের হাসি হেসে বন্ধুবান্ধবদের বলেন, ধন্য নাম রেখেছিলাম ছেলের—শান্ত !

শুধু নামটাই উপহাসের মতো শোনায় না, আরেকটা অট্টহাস লুকিয়ে আছে জীবন ঘোষের আলমারিতে। সেটা শানুর কুষ্ঠি। ভালো কুষ্ঠি দেখতে, রাশিচক্র বানাতে জানেন জীবনবাবু। জানতেন। তাই শানুর জন্মের পর একটা কুষ্ঠি বানিয়েছিলেন—পরাশর আর ভৃগু দু'মতে বিচার করে দেখেছিলেন—বিংশোত্তরী আর অষ্টোত্তরী। দুই বিচারেই মনে হয়েছিলো ছেলে তাঁর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হবে।

খ্যাতি তার হয়েছে ঠিকই, কুখ্যাতি। তা না হলে নাম শুনেই বিয়ে বাড়ির মেয়ের দল আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায় !

মুহূর্তের মধ্যে যেন চেহারা বদলে গেল সারা বিয়ে-বাড়ির। যে প্রথম দেখেছিলো, সে বললে পাশের জনকে তারপর এক কান থেকে অন্য কান। সবাই ভয়ে ভয়ে সরে এলো, সরে যেতে চাইলো। শানু ঘোষ ও বারান্দায় যাচ্ছে মাঝে মাঝে, দরকার নেই ওদিকে গিয়ে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করিস না, শানু ঘোষ কখন পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে গলার হারটা···

কমবয়েসী মেয়েগুলোর ভয় আরো বেশী। দু'কানের দুল জোড়া দু'হাতে আগলে আগলে ঘুরে বেড়ায় তারা। আর ভয়-ভয় চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে শানু ঘোষ কোথায় আছে।

সবারই মনে একটাই অভিযোগ শানু ঘোষ এসেছে কেন ? শানু ঘোষকে কেন নেমন্তন্ন করেছে ? নিমন্ত্রিত হয়েই এসেছে শানু, না কি রবাহূত—চুরির লোভে ?

চোরই হোক আর ডাকাতই হোক, রবাহূত বা অনাহূত যাই হোক, শানু ঘোষ জীবনবাবুর ছেলে। মুখের ওপর তাকে তো কেউ দূর দূর করতে পারে না।

নির্জন নিঃশব্দে ঘরের কোণে বসে ছিলো কমলা। এমনিতেই একটু

একা একা থাকতে ভালোবাসে সে। গল্পগুজব হাসি-ঠাট্টা রঙ্গরসিকতা যেন তার জন্যে নয়। নেহাত পিসতুতো বোনের বিয়ে, তাই আসতে বাধ্য হয়েছে সে। কিন্তু আসতে চায় নি।

বিয়ে-বাড়ির এই আলো-আনন্দ, এই সানাই আর শঙ্খধ্বনি যেন তার জীবনকে বিদ্রূপ করে প্রতিনিয়ত। তাই এক কোণে ভিড় থেকে গা বাঁচিয়ে একা একা বসে ছিলো কমলা। সে জানে তার তিরিশ বছরের যৌবনকে এই সানাই আর শাঁখের আওয়াজ কোনোদিন বুঝি উচ্চকিত করে তুললো না।

কমলা জানে, তার রূপ নেই। ছোটবেলা থেকে বার বার কথাটা শুনে এসেছে সে, শুনে এসেছে মার কাছ থেকেও। কমলা এও জানে, তার যৌবনকে উপঢৌকন দেবার মত পণের টাকা নেই তার বাবার। তাই অপরের বিয়ে দেখতে চায় না সে, দেখে বিতৃষ্ণায় জ্বলে যায়।

একা একা বসে ছিলো কমলা। ভাবে নি তার কাছেও কেউ ছুটে আসবে।

এলো। ফ্রক-পরা একটা মেয়ে বেণী দোলাতে দোলাতে ছুটে এসে ফিসফিস করে বললে, কমলাদি, কমলাদি!

কি! রুক্ষ গলায় প্রশ্ন করলে কমলা।

মেয়েটি কানের কাছে মুখ এনে বললে, সাবধান, শানু ঘোষ এসেছে! শানু ঘোষ!

নিরুৎসুক মন নিয়ে বসে ছিলো কমলা। বিয়ে-বাড়ির কোন-কিছুতেই তার যেন উৎসাহ নেই, উদ্দীপনা নেই। এমন কি উলু দিয়ে শাঁখ বাজিয়ে যখন গাড়ি থেকে বর নামানো হলো তখন সকলেই ছুটে গিয়েছিলো, যায় নি শুধু কমলা।

কিন্তু এমন একটা খবরে কমলাও বিচলিত হলো। আগ্রহ আর ঔৎসুক্যে উঠে দাঁড়ালো সে। বললে, কই, কোথায়?

নামটাই শুনে এসেছে সে এতদিন। শুনেছে শানু ঘোষ চোর।

জীবন ঘোষের ছেলে শান্নু ঘোষ বংশের কলঙ্ক। কিন্তু লোকটা কে, কেমন দেখতে। কপালে তার তেমন কোন চিহ্ন আছে কিনা!

ফ্রক-পরা মেয়েটা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলো। কমলাদি কি পাগল হয়ে গেছে নাকি? দেখতে যাবে? কোথায় শান্নু ঘোষের নাম শুনেই সাবধান হবে, সরে যাবে এখান থেকে, তা না, বলে কিনা, কই, কোথায়! সে নিজেই কি ছাই দেখেছে তাকে? চেনে?

তবু বলতে হলো, ওই বারান্দায় আছে।

—চলো তো দেখি!

মেয়েটির পিছনে পিছনে এলো কমলা। কই, কোন্ লোকটা শান্নু ঘোষ। সবাই তো ভদ্রলোক। দিব্যি ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় পরে আছে, হেসে হেসে কথাবার্তা বলছে। সিগারেট খাচ্ছে।

ফ্রক-পরা মেয়েটা কি বলবে খুঁজে পেলো না। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, নেই, চলে গেছে। বোধহয় ওপরে গেছে।

কমলা ফিরে এলো। ফিরে এসে ঘরের খোলা জানালাটার কাছে দাঁড়ালো। সত্যি, লোকটাকে দেখতে বড় ইচ্ছে তার।

সবাই যার নাম শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, না জানি কেমন দেখতে সে। ফ্রক-পরা মেয়েটা ছাদের দিকে ছুটে গেল শাঁখের শব্দ শুনে। একে একে সকলেই ছাদে যাচ্ছে। বিয়ের আসর বসেছে হয়তো। হ্যাঁ তাই, তা না হলে সানাই চুপ করলো কেন, হট্টগোল থামলো কেন!

কমলা একবার ভাবলে, ছাদে যাই। বিয়ে দেখার ইচ্ছে নেই তার। বিয়ে-বাড়িতে জমায়েত-হওয়া যুবক চেহারার লোকগুলোর প্রতিও তার কোন আকর্ষণ নেই। পুরুষ! পুরুষদের চিনতে বাকী নেই কমলার। কিন্তু ছাদে গেলে হয়তো শান্নু ঘোষকে দেখতে পেতো সে!

খুট করে শব্দ হতেই চমকে উঠলো। ফিরে তাকালো। কই

না, ঘরে তো কেউ নেই। তবে শব্দ কিসের! ঠিক মনে হলো কেউ যেন চাবি ঘোরালো।

এদিক ওদিক তাকালো কমলা। দরজার কাছ অবধি গেলো একবার। কই, কেউ কোথাও নেই।

খুট্। আবার একটা শব্দ হলো।

এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে কমলা। শব্দটা আসছে পাশের ঘর থেকে। দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকে পড়লো সে। পরক্ষণেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো।

ছিমছাম চেহারার একটা লোক আলমারি খুলে সন্তর্পণে কি যেন বের করছে।

কে লোকটা? কই, কমলা তো চেনে না।

দরজার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো কমলা। দেখলে, একটার পর একটা শাড়ি বের করছে লোকটা। শানু ঘোষ?

সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো তার, আতঙ্কে, বিস্ময়ে। ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেলো কমলা।

—কে আপনি?

চমকে উঠলো লোকটা। পালাবার চেষ্টা করলে কমলাকে দেখেই। কিন্তু তার আগেই কমলা তার একখানা হাত ধরে ফেলেছে খপ্ করে।

শরীরের শক্তিতে হয়তো পারতো না সে, কিন্তু কমলার স্পর্শে যেন অবশ হয়ে গেলো লোকটা, কমলার কৌতুকের হাসির বিদ্যুতে।

কমলা আবার প্রশ্ন করলে, কে আপনি?

ভাঙা ভাঙা উত্তর এলো, আমি, আমি শানু ঘোষ।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো কমলা—শানু ঘোষ!

—হ্যাঁ, আমি, আমি চোর শানু ঘোষ। বোকা বোকা দুটো চোখ মেলে লোকটা বললে।

কমলা আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো।

—চোর! চোর শান্তু ঘোষ! এত বড় পরিচয় আপনার? শান্তু ঘোষ চুপ করে রইলো, তারপর পালাবার জন্যে পা বাড়ালো। কিন্তু হাতেনাতে শান্তু ঘোষকে ধরেছে কমলা, ছাড়বে কেন। দুহাতে শান্তু ঘোষের শরীরটাকে জড়িয়ে ধরলো কমলা। বললে, পালাবেন না বলছি, পালাবেন না, তা হলে আমি চিৎকার করবো। বলে দেবো…

কি আশ্চর্য, সে-কথা শুনে নিশ্চল হয়ে গেলো শান্তু।

কমলা আবার হেসে উঠলো।—আপনি এত বড় চোর, এত নাম আপনার, আর ধরা পড়ে গেলেন আমার কাছে।

শান্তু ঘোষ এই প্রথম লজ্জা পেলো। মাথা নীচু করলে।

কমলা ধীরে ধীরে বললে, আপনি চুরি করতে পারেন জানি, কী চুরি করতে পারেন? ঘড়ি, আংটি, কাপড়? বলুন না, কি চুরি করতে পারেন? চোরকে আমার খুব ভালো লাগে…

শান্তু ঘোষের ভয় উঠে গেছে তখন। একটা কোমল নারীদেহের স্পর্শ, আর একটা রহস্যময় হাসির কাছে পরাজিত হয়ে গেছে সে তখন।

ধীরে ধীরে লজ্জিত লাঞ্ছিত মুখখানা তুলে কমলার মুখের দিকে তাকালো সে। এতদিনে সে একজনের কাছে তার চৌর্যবৃত্তির প্রশংসা শুনতে পেয়েছে। কি আশ্চর্য, যে অপরাধের জন্যে শুধু ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ভোগ করে এসেছে সে সারাজীবন, সেই অপরাধকে এ মেয়ে অপরাধ মনে করে না? সত্যি! বিস্ময়ে চোখ তুলে তাকালো শান্তু।

বললে, মিছে কথা, চোরকে কারও ভালো লাগে আবার।

—লাগে। কিন্তু বড় চোরকে। যারা ছুটকোছাটকা জিনিস চুরি করে তাদের নয়।

—তবে? বড় জিনিস? দামী জিনিস?

কমলা আবার হাসলো।—হ্যাঁ, মানুষের মত দামী জিনিস।

—মানুষের মত ? চোখ কপালে উঠলো শানুর।

কমলা আবার হাসলো।—আমার মতো। পারবেন ? আমার মতো একটা মেয়েকে চুরি করতে পারেন ?

শানু অবোধ্য রহস্যের মত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

তারপর বললে, কিন্তু, কিন্তু তা হলে যে আর কিছু চুরি করতে ইচ্ছে হবে না আমার। তুমি, তোমার মত মেয়ে—

কমলা এইবার ফিসফিস করে বললে, নাই বা হলো।

বলে শানুর হাত ধরে টানতে টানতে বাড়ির খিড়কির দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে বললে, আমাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেলে আমার এত ভালো লাগে—

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো শানু ঘোষ। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, না, না, আমি চোর, আমি চোর।

আর কমলার মনে হলো, শানু ঘোষ যেন চিৎকার করে বলছে, তুমি চোর, তুমি চোর !

টাকার দাম

শিবপ্রসাদবাবু অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন না। তিরিশ-বত্রিশ বছর আগে কলেজে সামান্য কয়েকখানা অর্থনীতির বই পড়েছিলেন। জীবনযুদ্ধে নেমে দেখলেন সে-সব নিয়মনীতি বৃথা। বইয়ে-পড়া অর্থনীতির সঙ্গে জীবনের আর্থিক নীতির কোন সম্পর্ক নেই, কোন মিল নেই। এ সমাজে নিজের চেষ্টাতেই নিজের জীবনকে সাজিয়ে নিতে হয়, নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার ব্যবস্থাও নিজেকেই করতে হয়। তাই নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে যতটা সম্ভব সঞ্চয়ের দিকে মন দিয়েছিলেন। শুধু দুর্দিনের আশঙ্কাতেই নয়, সুদিনের আশাতেও মানুষ সঞ্চয় করে। সঞ্চয় ছাড়া ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আর কি ব্যবস্থা আছে।

চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বছর কয়েক আগে থেকেই ছেলে-মেয়েরা বলতে শুরু করলো, এবার কোলকাতায় একটা বাড়ি করা দরকার।

স্ত্রী হেমলতা দেবীও সায় দিলেন, হ্যাঁ, চিরটা কাল কি ভাড়া বাড়িতেই থাকবো নাকি ?

যুক্তিটা মন্দ লাগলো না শিবপ্রসাদবাবুর। একটা বাড়ি, ছোট্ট একখানা বাড়ি। বেশ সুন্দর ছিমছাম দেখতে, সাদা ধবধবে একখানা বাড়ি। একটা সাদা বাড়ি। বাড়ি নয়, যেন একখানা শ্বেতশুভ্র পতাকা, একটা সাদা ঝকমকে পায়রা। শান্তি, বিশ্রাম, নিশ্চিন্ততার প্রতীক যেন।

মন্দ কি। যা-কিছু জমাতে পেরেছেন, তার সঙ্গে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের গচ্ছিত টাকা যোগ দিয়ে ছোটখাটো একখানা সুন্দর বাড়ি তৈরী করা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

কিন্তু, বাড়িটা এখনই করা কি যুক্তিযুক্ত? সবে যুদ্ধ থামলো, জিনিসপত্রের দাম এখনো আগুন হয়ে আছে। তিনগুণ দাম দিয়ে লোহালক্কড় কিনতে হবে, পাঁচগুণ দাম দিয়ে সিমেণ্ট। তার চেয়ে আর কয়েকটা বছর যাক না। ইঁটের হাজার পনেরো বিশ টাকায় নেমে যাবে তখন। জমির দাম হবে আধাআধি।

দাম তো বেড়েছে যুদ্ধের জন্যে, এ-দাম তো আর থাকবে না।

স্ত্রী হেমলতা হাসলেন।—তা হলেই হয়েছে। জিনিসের দাম আবার কোনকালে কমেছে, ও একবার উঠলে আর নামে না।

শিবপ্রসাদবাবু বিজ্ঞের মতো হাসলেন।—এমনি আগুন দাম থাকবে চিরকাল? কী যে বলো। চুরি জোচ্চুরি ব্ল্যাকমার্কেট করে করে লোকের হাতে এখন টাকা এসেছে, ব্যবসাদারগুলোও হয়েছে ডাকাত, যা পাচ্ছে লুটে নিচ্ছে। যুদ্ধ থেমে গেলো, এর পর দেখবে তরতর করে নেমে যাবে সব জিনিসের দাম।

হেমলতার গলার স্বরে এবার উষ্মা প্রকাশ পেলো। বললেন, বাজে বকিও না। সেই ষোল বছর বয়েস থেকে তো শুনছি সোনার দাম কমলে বিছে হার গড়িয়ে দেবো। কমলো? পনেরো-বিশ-তিরিশ-চল্লিশ করে এখন তো আশি টাকা ভরি। দেখো বাপু, মেয়েছেলেদের মাথায় যা ঢোকে তোমাদের পুরুষমানুষদের মাথায় তা ঢোকে না। সোনার দাম কমে না, আর টাকার দাম বাড়ে না। ঘরে সোনা থাকলে ডিম পাড়ে, টাকা থাকলে ঘুণ ধরে।

শিবপ্রসাদবাবু হেসে বললেন, সে দিনকাল এখন আর নেই। মাটিতে নোট পুঁতে রাখলে ঘুণ ধরে বটে। কিন্তু ব্যাঙ্কে রাখলে সেও ডিম পাড়ে।

অর্থাৎ টাকাগুলো আরো কয়েকটা বছর থাকলে সুদ বাড়বে। দুটো বছর আগে আর দুটো বছর পরে—কি এমন তফাত। মাঝখান থেকে যদি কয়েক হাজার টাকা সুদ বেশী পাওয়া যায় মন্দ কি।

হেমলতা দেবী রেগে উঠে পড়লেন, দপদপ করে পা ফেলে চলে গেলেন উনোনে চড়িয়ে-আসা ডালটা পুড়ে গেলো কিনা দেখতে। এই মানুষ আবার বাড়ি করবে। টাকা যেন শরীরের রক্ত। ভালো কাজে খরচ করতেও সই সরে না।

টাকা অবশ্য শরীরের রক্তই। শিবপ্রসাদবাবুর চেয়ে সে কথা আর কেউ বেশী জানে না। সারা জীবন ধরে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে তবে এই সামান্য কিছু টাকা জমেছে। জমেছে মানে? এই টাকাই তো সারা জীবনের ভবিষ্যৎ। রোদজল মানেন নি, শরীর মন তুচ্ছ করেছেন, কতদিন ছোটসাহেবের সঙ্গে মন কষাকষি হয়ে চাকরি ছেড়ে দেবেন ভেবেও ছাড়তে পারেন নি, সেকশনের কেরানীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে ফেলে অনুশোচনায় ভেঙে পড়েছেন, তবু চাকরির মায়া ছাড়তে পারেন নি। কেন? সে তো শুধু বর্তমান ভেবে নয়, ভবিষ্যৎ ভেবে। চুনারের বেগুনের মতো মাইনেটা যেদিন দিশী বেগুনের পেনশনে এসে দাঁড়াবে সেদিন চলবে কি করে।

—সেই জন্যেই তো বলছি বাড়ি একটা করে ফেলো। হেমলতা দেবী আবার একদিন বলে বসলেন, শিবপ্রসাদবাবুর মেজাজ ভালো দেখে। বললেন, মাথা গোঁজবার জায়গা থাকলে পেটে গামছা বেঁধেও চলে যায়।

শিবপ্রসাদবাবু হাসলেন কথা শুনে। তারপর সায় দিয়ে বললেন, বেশ, জমিটমি তা হলে একটা দেখতে বলো ছেলেদের।

ব্যস, মত যখন হয়েছে তখন আর দেরি নয়। হেমলতা বড় আর মেজো ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেলেন ইশারায়, ছাদের ঠাকুরঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিলেন, জমিটমি দেখ তোরা, মত হয়েছে ওঁর।

জমি খুঁজতে শুরু করে দিলে অতুল আর প্রতুল। দিনকয়েক খুব হুড়োহুড়ি চললো। ট্রামে বাসে ঘোরাঘুরি, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন, দালালদের সঙ্গে জমি দেখতে যাওয়া।

অতুল একদিন এসে বললে, বাবা আজ একটা জমি দেখে এলাম, খাসা। পুব দক্ষিণ খোলা, পাড়াটাও—

—কোথায় ?

—লেক রোডের পুবে যে রাস্তাটা······

—কত করে ?

—তিন হাজার······

—তিন হাজার ? মাথা খারাপ হলো নাকি তোদের ? এই সেদিনও ন'শো টাকা করে ছিলো ওদিকের জমি, এখন আঠারো শো হোক !

সুতরাং খোঁজ চললো দু'হাজার টাকা কাঠার। আঠারো শো বলেছেন, টেনেটুনে বড় জোর দু'হাজারে তোলা যাবে। অতএব······

খোঁজ চললো আবার। বিজ্ঞাপন, দালাল, ঘোরাঘুরি। প্রতুল শেষ পর্যন্ত একটা খবর নিয়ে এসে হাজির হলো।

বললে, ফার্ন রোডের কাছে দু'হাজার টাকা কাঠা, ফাইন !

—পুব খোলা ?

—তা পুব খোলা, দক্ষিণ—তাও হ্যাঁ খানিকটা খোলা।

—তবেই হয়েছে। আপিস যেতে তোদের দু'ঘণ্টা লাগবে, আর আমি বুড়ো বয়সে বসে বসে হাতপাখা নাড়বো, না কি ?

অতুল প্রতুল হেমলতা দেবী আবার পরস্পরকে ইশারা করে ছাদের ঠাকুরঘরটির কাছে উঠে এলো, ফিসফিস করে শুরু হলো জল্পনা-কল্পনা।

হেমলতা দেবী বিষণ্ণ মুখ করলেন; অতুল হাল ছেড়ে দিয়ে বললে, বামুনের গরু কেনা বাপু আমার দ্বারা হবে না; প্রতুল বললে, বাবার বাড়ি করার ইচ্ছে নেই।

ছেলেরাই হেমলতা দেবীর একমাত্র হাতিয়ার। হাল ছেড়ে দিলে তাঁর চলবে না। তাই অতুল-প্রতুলকে বুঝিয়ে সুজিয়ে আবার জমির

খোঁজে লাগাতে হয়। ছেলেরা আবার হায় হায় করে ঘুরে বেড়ায় দিনকয়েক। আবার খোঁজ আনে, আবার নাকচ হয়ে যায়--কখনো দামের জন্যে, কখনো পাড়া ভালো নয়, কখনো পুব-দক্ষিণের বায়নাক্কা।

এমনি করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়! চাকরি থেকে অবসর নেবার দিনও ঘনিয়ে আসে। আর যত দিন ঘনিয়ে আসে ততই শিবপ্রসাদবাবু নিজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন জমি কেনার জন্যে। চাকরি ছেড়ে পেনশনে তো আর চলবে না। তা ছাড়া আপিস থেকে বাড়িভাড়া বাবদ যে টাকাটা পাচ্ছেন তাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভাড়া গুণবেন তখন কি করে? কই, জিনিসপত্রের দাম তো কমছে না। না লোহা-কাঠ-সিমেন্টের, না চাল-চিনি-তেলের। তবে কি কমবে না জিনিসের দাম?

হেমলতা দেবী হাসেন সে-কথা শুনে।—গরিবের কথা বাসি হলে মিষ্টি হয়, বুঝলে!

তবু স্তোকবাক্য ছাড়েন শিবপ্রসাদবাবু।—কমবে, কমবে। কথাটা যেন নিজেকেই সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

হেমলতা হাসেন।—চালের দাম মনে আছে, সাঁইত্রিশ সালে ছিলো টাকায় এগারো সের সরু রামশাল, বেড়ে বেড়ে কত হলো?

শিবপ্রসাদবাবু বলেন, ও-সব হোর্ডারদের কারসাজি, সত্যি কি অত দাম হয় নাকি চালের?

—কেন হবে না শুনি? দু আনা রোজ দিয়ে বাবা দেশে পুকুর কাটিয়েছিলো, দু টাকা রোজে এখন মুনিষ পাবে? ক্যানেল কর ছিলো তখন? খোলের বস্তা কত করে জানো? দু'শো টাকা এক জোড়া বলদের দাম, আগে দু'শো টাকায় সারা বৃন্দাবন কেনা যেত।

শিবপ্রসাদবাবু কথা খুঁজে না পেয়ে হেসে বলেন, তোমার যেমন কথা!

হেমলতা রেগে যান। বলেন, আমার বাবা তো চাকুরে নয় তোমাদের মতো, চাষ দেখে নিজে, জমিজমা আছে বিঘে দরুনে, তোমাদের মত এক কাঠা দুকাঠার জন্যে হাহুতাশ করে বেড়ায় না।

আহত হন শিবপ্রসাদবাবু, চুপ করে যান। কি করে বোঝাবেন কোলকাতার জমি আর দেশগাঁয়ের জমি এক নয়। বললেও হয়তো উত্তর দেবে, জমি একই, ভাগ্যক্রমে শহর হয়ে গেছে তাই।

সে যাই হোক্, তর্ক করে তো লাভ নেই। জমি এক টুকরো দরকার, এক টুকরো জমি। তার ওপর ছোট্ট একখানা বাড়ি, মাথা গোঁজবার ঠাঁই। খানকয়েক ঘরের ছোট্ট একখানা বাড়ি, সাদা বাড়ি একখানা, সাদা—ঝকঝকে পায়রার মত সাদা। বিশ্রাম, নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা।

এবার শিবপ্রসাদবাবু নিজেও উঠে পড়ে লাগেন। নিজেই মাঝে মাঝে জমি দেখতে বেরোন। কিন্তু, কি আশ্চর্য, এদিকে আসেন নি কতদিন? কয়েক বছরই পার হয়ে গেছে নাকি? তা যাক, কিন্তু এত বাড়ি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে? কত জমি তো ছিলো এ-সব দিকে। ভালো ভালো জমি, পুব-দক্ষিণ খোলা, রাস্তার ওপরেই। এখন যে বেশির ভাগ সবুজই ঢাকা পড়ে গেছে? সব সবুজ সাদা হয়ে গেছে—সাদা সাদা বাড়ি। নিজেরই অজান্তে শিবপ্রসাদবাবুর সবুজ মনটা যেমন হঠাৎ কখন যেন তার চুলের মত সাদা হয়ে গেছে তেমনিভাবে।

তবু, এরই মধ্যে একটা জমি খুঁজে নিতে হবে।

দালালের সাহায্যে শেষ পর্যন্ত লেক রোডের উত্তরে একটা জমি পাওয়া গেলো। কিন্তু সাড়ে চার হাজার টাকা কাঠা।

সাড়ে চার হাজার!

চোখ কপালে উঠলো শিবপ্রসাদবাবুর। না, চার হাজার পর্যন্ত উঠতে রাজি আছেন, তার বেশি নয়।

শুনে হাসলো অতুল। মাকে গিয়ে বললে, দক্ষিণ-চাপা এ-জমির জন্যে চার হাজারে রাজি হচ্ছেন, অথচ ওর পাশের অত ভালো জমিটা তখন তিন হাজারে রাজি হলেন না।

হেমলতা বললে সে-কথা। শুনে শিবপ্রসাদবাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন, বললেন, তা বটে, তবে ওটা থাক, অন্য জমিই দেখি। বরং ফার্ন রোডের দিকে···

ফার্ন রোডের জমিটা দেখে মোটামুটি পছন্দই হলো। দক্ষিণ চাপা হলে কি হবে, পুবটা একেবারে খোলা! তা ছাড়া বাস-ট্রাম তো রয়েছে, কত লোক তো ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে আপিস করে, কি আর এমন দূর হবে অতুলের।

কিন্তু দামটা বড় বেশী চাইছে। সাড়ে তিন হাজার করে কাঠা!

প্রতুল হেমলতা দেবীকে ছাদের ঠাকুরঘরের সামনে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, দেখলে মা! তখন দু-হাজারে পাওয়া যেতো এর চেয়ে কত ভালো জমি, দূর বলে রাজি হলেন না···

হেমলতা দেবী চোখের জল ফেলে বললেন, আমি আর কি বলবো বল।

বললেন বটে, তবু না বলেও থাকতে পারলেন না। অভিযোগের সুরে শিবপ্রসাদবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, প্রতুল যখন ফার্ন রোডের জমিটা দু-হাজারে ঠিক করে এলো···

—তুমি ক্ষেপেছো নাকি! হাসলেন শিবপ্রসাদবাবু। বললেন, ও আমি তিন হাজারের বেশি এক পয়সা দেবো না।

শিবপ্রসাদবাবু প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকলেই তো আর বেচাকেনা বন্ধ থাকবে না। দিনকয়েক পরেই জানা গেল, জমিটা তিন হাজার দুশো টাকা দরে বিক্রি হয়ে গেছে।

সুতরাং আবার খোঁজো, আবার দেখো।

টালিগঞ্জ? ওই জলে-ডোবা ব্রিজ পার হয়ে? তা, তাই হোক।

ছু-বছর আগে অবশ্য নাক সিঁটকে ছিলেন, কিন্তু সস্তায় আর যখন কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া চারু অ্যাভিনিউ পাড়াটা ভালোই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

একটা জমি পাওয়া গেল পছন্দসই। পুবটা চাপা, দক্ষিণ কিন্তু একেবারে খোলা। দক্ষিণেই রাস্তা। জমিটাও বেশ উঁচু—পুকুর-বোজানো জমি নয়। বাড়ি ধসে যাবার ভয় নেই।

দাম ?

তিন হাজার টাকা কাঠা।

তিন হাজার ? তা হলে ফার্ন রোডের জমিটা কি দোষ করলো ? ছু-শো টাকা বেশী দিলেও তো অনেক ভালো হতো। না, ও ব্রিজ পার হয়ে যাওয়া মানে নোংরার সমুদ্র সাঁতরে পার হওয়া। টিপটিপ বৃষ্টি হয়েছে কি ট্রাম বন্ধ, তার চেয়ে বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌সের দিকে কি একটা জমি যেন আছে বলছিল···বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স, বেশ নামটা !

ছু-বছর আগে এ-সব নাম শুনে হাসতেন শিবপ্রসাদবাবু। বলতেন, কলেজে পড়ার সময় একবার ছ্যাকরা গাড়ি করে কালীঘাটে এসেছিলাম, বাড়ি ছিল কয়েকটা ওই ভবানীপুরে, আর মন্দিরের কাছে, আর সব জলা-জঙ্গল ! শেয়ালের ডাক অবশ্য এখনো শোনা যায়, আগে সন্ধ্যে হলেই হুক্কা হুয়া। তার আজকাল কতরকম নাম—ধান জমির রাস্তা তার নাম কর্নফিল্ড রোড, ঘাস নেই পার্ক, গাছ নেই গার্ডেন্‌স।

সেই শিবপ্রসাদবাবুই বললেন, বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স পাড়াটা ভালোই !

কিন্তু দর-দাম শুনে হকচকিয়ে গেলেন। সে কি, এত দাম হবে কেন এদিকের জমির ! নাক থেকে রুমাল সরালে খাটালের গন্ধ আসে, একখানা গাড়ি না থাকলে যাতায়াত দুষ্কর, আর গাড়ি না হয় নিজেদের জন্যে রইলো, ঝিকে বাজারে পাঠাবার জন্যে তো গাড়ি

রাখতে পারবেন না, তবে? আর জমিগুলোও তো বেশ নীচু, জল দাঁড়ায়, পুকুর-বোজানো জমি কিনা কে জানে।

না, না, সারা জীবনের সঞ্চয়, ভবিষ্যতের সম্বল এমন ভাবে না ভেবে চিন্তে জলে ফেলতে পারবেন না।

অবসর নেবার দিন যত ঘনিয়ে আসে হেমলতা তত তাড়া দেন, আর হেমলতা যত তাড়া দেন শিবপ্রসাদবাবু তত বিরক্ত হন। বাড়ি করবো, জমি কিনবো সবই সত্যি, তা বলে সেই রূপকথার রাজার মত প্রতিজ্ঞে করে তো বসি নি যে সকালে উঠে যার মুখ দেখবো তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবো।

বড় ছেলে শুনে বললে, অমনি একটা প্রতিজ্ঞা না করে বসলে বাড়ি হবে না।

শিবপ্রসাদবাবু শুনলেন কথাটা, মনে মনে বললেন, অর্বাচীন!

কিন্তু চটপট এত বাড়ি হচ্ছেই বা কি করে, লোকে এই আগুন দামে জমি কিনছেই বা কি করে! ব্ল্যাকমার্কেট, ব্ল্যাকমার্কেট—সব ব্ল্যাকমার্কেটের টাকা।

হেমলতা দেবী প্রতিবাদ করেন—কেন, চাকুরে লোকেরা কি বাড়ি করছে না?

—করছে, চাকরির টাকায় নয়, ঘুষের টাকায়। যে যতই মাইনে পাক না কেন, উপরি আয় না থাকলে এত দাম দেওয়া সম্ভব নয়, এ বাজারে বাড়ি করা—

শিবপ্রসাদবাবুর কাছে ব্যাপারটা সত্যিই রহস্য মনে হয়। তিনিও তো মোটা মাইনের চাকরিই করে এসেছেন, টাকাও খরচ করেছেন এমন কিছু মড়ার পিছনে খই ছড়ানোর মতো করে নয়, তবে?

ভাবতে ভাবতেই কেমন করে দিনগুলো কেটে গেল, শিবপ্রসাদবাবু রিটায়ার করলেন।

আঃ বিশ্রাম। পরম শান্তি। আর দশটা পাঁচটা করতে হবে

না, আপিসের কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তায় চমকে উঠতে হবে না ঘুমের মধ্যে। এবার অবসর পাওয়া গেছে। হাতে অফুরন্ত সময়। সুতরাং রয়ে বসে এইবার একটা জমি দেখতে হবে, একটা পছন্দসই বাড়ি করতে হবে।

ভুল অবশ্য করেছেন। ভুল করেছেন সেই যুদ্ধের সময়েই। তখন জমির দাম সস্তা ছিল, বাড়ির দামও। কিন্তু জাপানী বোমায় সারা কোলকাতা দুরমুজ হয়ে যাবে এই আশঙ্কায় সুযোগ পেয়েও কেনেন নি জমি, বাড়ি। কিনে রাখলে আজ আর এই দুর্ভোগ হতো না।

কিন্তু দুর্ভোগ যে এত বাড়বে তাই বা কে জানতো। অবসর নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িওয়ালা ব্যবহারটা ইদানীং একটু খারাপ করতে শুরু করেছে। করবে না কেন! বাড়িভাড়া যে হারে বাড়ছে, বাড়িওয়ালাদের লোভ বাড়ছে তার শতগুণ। পুরোনো ভাড়াটেকে তুলে দিয়ে নতুন ভাড়াটে বসাতে পারলেই ডবল ভাড়া পাবে।

আর ভাড়াই বা ডবল হবে না কেন? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগতেই পুব বাংলার লোক আসতে শুরু করেছিল লাখে লাখে। সঙ্গে প্রথম প্রথম তারা অনেকে নিশ্চয় টাকাও এনেছিল লাখে লাখে। তা না হলে জমি বাড়ি কিনতে পারলো কি করে পটাপট—দ্বিগুণ ভাড়ায় বাড়িই বা নিলো কি করে?

পাকিস্তান হয়ে গেলো, দেশ স্বাধীন হলো, আর জমির দামও বাড়তে শুরু করলো তরতর করে। যে জমিতেই হাত দিতে যান শিবপ্রসাদবাবু, ছ্যাঁকা লাগার ভয়ে হাত সরিয়ে নেন, আগুন দাম।

হেমলতা বলেন, জমির দাম এমনিও বাড়তো, ওরা আসাতে একটু তাড়াতাড়ি বাড়লো। জিনিসের দাম, জমির দাম কবে কমেছে? ও চিরকাল বেড়েই যায়, বেড়ে যেতেই দেখলাম। বিয়ে হয়েছিলো যখন—সোনার ভরি ছিলো তেরো টাকা, এখন আঠানব্বই।

বড় ছেলে অতুল বললে, এখন আর এদিকে খোঁজ করে লাভ নেই,

পাঁচ ছ'হাজারের কমে জমি মিলবে না, তার চেয়ে টালিগঞ্জের ওদিকে কিংবা যাদবপুরের দিকে হয়তো···

কিন্তু সে যে অনেক দূর। আনডেভেলপড এরিয়া। জল আর জঙ্গল। বাসের জন্য আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাছাড়া জমিটা যদি বা আড়াই হাজার তিন হাজার দরে পাওয়া যায়, সিমেণ্ট লোহা ইঁট কাঠ তো আগুন। বরং আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে খোলাবাজারে লোহা সিমেণ্ট পাওয়া যাবে। এখন গবরমেণ্ট ডিভিসি টিভিসি করছে, কারখানা খুলছে চতুর্দিকে, ওগুলো হয়ে গেলেই সব পাওয়া যাবে, কম দামেই পাওয়া যাবে।

সেই ভেবেই বসেছিলেন শিবপ্রসাদবাবু। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছিল বসে বসেই। সকালে খবরের কাগজ, দুপুরে ঘুম, বিকেলে সান্ধ্যভ্রমণ। বেশ নিশ্চিন্ত বিশ্রামেই কাটছিল দিনগুলো। দুশ্চিন্তা দেখা দিতো শুধু মাঝে মাঝে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে হলেই। অথচ না তুলেই বা উপায় কি। জিনিসের দাম বেড়েছে বলে তো পেনসনের অঙ্কটা বাড়ে নি। তা ছাড়া বাড়িভাড়াটা সবাই যদিও বলে সস্তা তবু শিবপ্রসাদবাবুর কাছে তা গন্ধমাদন। আপিস থেকে তো আর বাড়িভাড়ার অর্ধেক পান না এখন।

মাসে মাসে সঞ্চিত অর্থ থেকে কিছু কিছু তুলতে তুলতে ক্রমশ তাঁর মনটাও তিক্ত হয়ে ওঠে। চাকরি ছেড়ে পরম নিশ্চিন্তির বিশ্রাম পাবেন সারা জীবন ভেবেছিলেন। নিরাপত্তার আশায় সঞ্চয় করে এসেছেন। কিন্তু সব স্বপ্ন যেন তাঁর ভেঙে যাচ্ছে। মন বিষিয়ে ওঠে তাঁর—বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, ছেলেদের বিরুদ্ধে। দু-দুটো ছেলে—অথচ তাদের রোজগারে সংসার চলে না। এত কম মাইনে পায় ছেলেরা—তার জন্যে যেন তারাই দায়ী। যেন ইচ্ছে করেই বেশী মাইনে নিচ্ছে না।

না, একটা বাড়ি না করলে আর চলে না। যে হারে টাকা

তুলছেন ব্যাঙ্ক থেকে শেষের দিন-ক'টা হয়তো খেতে পাবেন না। তার চেয়ে যেখানে হোক, যেমন করে হোক একটা বাড়ি করে ফেলতে হবে।

খাতা পেন্সিল নিয়ে বসেন শিবপ্রসাদবাবু। আর ব্যাঙ্কের পাশ বই। শেয়ার আর সেভিংস সার্টিফিকেটগুলো।

কিন্তু এ কি? হিসেব কষতে কষতে মাথায় রক্ত চড়ে যায়। এত টাকা খরচ হয়ে গেছে এ কটা বছরে? আশ্চর্য তো! অথচ ভেবেছিলেন দশটা বছর ব্যাঙ্কে টাকাগুলো রাখতে পারলে সুদসমেত দেড়গুণ হয়ে দাঁড়াবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দু-কোণ জ্বালা করে উঠলো, ব্যর্থতায়, হতাশায়।

বললেন। নাঃ, বাড়ি করবার মতো টাকা আর নেই, সব শেষ করে এনেছো তোমরা।

হেমলতা চটে গেলেন।—আমরা শেষ করে এনেছি, না, তুমি শেষ করে এনেছো।

—আমি?

—হ্যাঁ তুমি। খরচ না হলেই বা কি হতো, তোমার টাকাটা না হয় দেড়গুণ হতো, কিন্তু জিনিসের দাম জমির দাম যে দশ বছরে চার গুণ হয়েছে, খেয়াল আছে।

শিবপ্রসাদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা সত্যি! কি আর করবো বলো!

হেমলতা হাসলেন, তাচ্ছিল্যের, ব্যঙ্গের, দুঃখের হাসি। বললেন, খনই বলেছিলাম টাকা সুদে বাড়ে না, টাকা সুদে কমে।

শিবপ্রসাদবাবু উত্তর দিলেন না, চুপ করে রইলেন। জীবনের অভিজ্ঞতায় হেমলতার কথাই তো সত্যি মনে হচ্ছে, কিন্তু কলেজে পড়ার সময় সেই যে ক-খানা অর্থনীতির বই পড়েছিলেন সে বই-পড়া

বিত্তের কাছে ব্যাপারটা কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে! সত্যিই তো, যে হারে সুদ জমে তার চেয়ে জিনিসের দাম বাড়ার হারটা অনেক বেশী!

আর—

আর জিনিসের দাম বেড়েই চলে, কমে না, কমে না। অর্থনীতির বই বেশী পড়েন নি তিনি, কিন্তু ইতিহাসটা তো ভালো করেই পড়েছিলেন। তিনি তো জানতেন, আকবরের সময়ে ধানের দাম যা ছিল আওরংজেবের সময়ে ছিল তার চেয়ে বেশী। কোম্পানীর আমলে যা দিন ছিল মহারানীর আমলে তার চেয়ে বেশী। আর ইংরেজ আমলে যা ছিল স্বাধীনতা পাওয়ার পর···

নিজের মনেই বিড়বিড় করেন শিবপ্রসাদবাবু।—সোনার দাম বাড়ে, টাকার দাম কমে। সোনা রাখলে ডিম পাড়ে, টাকা রাখলে ঘুণ ধরে। টাকা সুদে বাড়ে না, টাকা সুদে কমে।

জমি, বাড়ি, আসবাবপত্র—এ সবই তো সোনা। রাখলে বাড়তো।

সামনের ছাদটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকালেন শিবপ্রসাদবাবু।

বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি। আর কার্নিসে বসে একটা সাদা ফুটফুটে পায়রা ভিজছে। ভিজে পালকগুলো কেমন যেন কালো কালো দেখাচ্ছে।

নমিতার প্রতিশোধ

প্রথম প্রথম কেউ বুঝতে পারে নি। নমিতার বাবা মাও না। বুঝতে পারে নি বলেই বাবাও ঠাট্টা করে অনেক সময় বলেছে, নমি আমার পাগলী মেয়ে। মায়ের আদর মনে মনে, তাই মুখে ঝাঁজ দিয়ে মা বকুনি দিয়েছে, কি যে করিস পাগলের মতো, ভব্যতা শিখবি কবে !

না, কেউই বুঝতে পারে নি। পাড়ার লোক, রাস্তা দিয়ে যারা যেতো, সকলেই তাকাতো ওর দিকে, হাসতো, তারপর একটু বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে চলে যেতো।

নমিতার দিকে ফিরে তাকানোটা অন্যায় নয়, অস্বাভাবিক নয়।

পাড়ায় ওর মতো যুবতী বয়সের মেয়ে কম ছিল না, সুশ্রী মেয়েও। তবু সকলের থেকে ও কোথায় যেন একটু পৃথক। সুন্দরী যে খুব, তা নয়, বেশবাসেও এমন কিছু কেতাদুরস্ত নয়। কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে ওর যৌবনের চোখে, ওর রহস্যময় শরীরের ভাঁজে ভাঁজে কি এক ধরতে-না-পারা চটক ছিল। হয়তো কালো আর কৌতুকে উচ্ছল চোখের তারায়।

তাই নমিতা যখনই দোতলার বারান্দাটিতে এসে দাঁড়াতো তখন ফিরে না তাকিয়ে পারতো না কেউ।

কচি কচি সরল সুশ্রী একখানা মুখ, সহজ শান্ত দুটি চোখ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো, হঠাৎ হেসে উঠতো, ফুঁ-দিয়ে-নিভিয়ে-দেওয়া প্রদীপের মতো অকারণ আকস্মিকতায় গম্ভীর হয়ে যেতো সে মুখ, কপালে ফুটতো কয়েকটা বিরক্তির রেখা, তারপর কি ভেবে সাপের মতো দুটি সুপুষ্ট বেণীকে গলায় পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দম বন্ধ করার যোগাড় করতো।

মা ছুটে এসে তার শক্ত মুঠি থেকে বেণীটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করতো ঃ ছাড়, ছাড়, মরে যাবি যে! তোকে নিয়ে কি যে করি আমি! বলে দু-চোখ কান্নায় উথলে উঠতো মার।

হ্যাঁ, এখন সকলেই বুঝতে পেরেছে। মা আর বাবাও তাই পাগলী বলে আর ঠাট্টা করতো না, আদর সোহাগ জানাতো না।

অথচ কেন যে এমন হলো কে বলবে! প্রেম? কে জানে! পাড়ার একটা ছেলের দিকে বারবার তাকাতো বটে, তার কথা শুনতে চাইতো, বলতো—নমিতার সমবয়সী বন্ধুরা বললে। কিন্তু তেমন আগ্রহ, একটু যৌবনের চঞ্চলতা কোন্ মেয়েরই বা নেই। তা বলে হঠাৎ পাগল হয়ে যাবে কেন?

ডাক্তার দেখালেন সতীনাথবাবু। বললেন, না, কোন পুরুষেই আমাদের বংশে এ রোগ ছিল না। মামাদের বংশেও না।

তবে?

চিকিৎসার ত্রুটি করেন নি সতীনাথবাবু। রাঁচী পাঠিয়েছিলেন। বছরখানেক ছিল সেখানে। কিন্তু কোন কাজ হলো না। বাড়িতেই আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে এসেই যতো জ্বালা। কি করবেন এ মেয়েকে নিয়ে। শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে পারতেন বদ্ধ উন্মাদ হলে, কপাটে তালা দিয়ে বন্দী করে রাখতে পারতেন ঘরের মধ্যে।

কিন্তু নমিতা যে পাগল হয়ে গেছে, তা যে বোঝা যায় না, বুঝতে পারে না কেউই। চিৎকার করে না, কাঁদে না, মারে না, কামড়ায় না।

কিছুই করে না সে। কিংবা যা কিছু করে সবই সাধারণ আর পাঁচটা মেয়ের মতোই। স্বাভাবিক। দিব্যি কথা বলে, গল্প করে, হাসে, মানুষ চিনতে পারে। এমন কি নমিতা যে পাগল এ-কথা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছে যখন বলতে বাধ্য হয়েছিল সতীনাথবাবু তখনও বেশ বুঝতে পেরেছেন তিনি, তারা যেন তাঁর কথা বিশ্বাস করতে

চাইছে না। কেউ কেউ তাঁর এ-কথার পিছনে একটা উদ্দেশ্য খুঁজে বের করতে চেয়েছে।

দু-একজন ভেবেছে: মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, তাই সেটুকু ঢাকবার জন্যে এ-সব ফন্দি—আমরা কি আর বুঝি না।

সতীনাথবাবুর কানেও এসেছে এ-কথা। শুনে হেসেছেন তিনি। দুঃখের হাসি।

মেয়ের বিয়ে যে দিতে পারবেন না তা অবশ্য সতীনাথবাবু জানতেন। কে এই পাগল মেয়েকে বিয়ে করবে! বিয়ের কথা তুলবেনই বা কি করে! সতীনাথবাবু তাই নমিতার বিয়ের কথা ভাবতেনও না।

ভাবতেন না বলেই চমকে উঠেছিলেন এমন একটা কথা শুনে।

নমিতাকে নিয়েই তার মা গিয়েছিলেন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। মেয়েকে, বিশেষ করে এ-বয়সের মেয়েকে বাড়িতে একা রেখে যেতে পারেন না বলেই নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর সেখানেই বন্ধুত্বের সূত্রে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা।

নমিতাকে দেখে তাঁর ভারী পছন্দ। নমিতাকে পাশে বসিয়ে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সতীনাথবাবুর স্ত্রীকে তিনি বলে বসলেন, এমন লক্ষ্মী একটি মেয়ে পেতাম, বিয়ে দিতাম আমার সৌমেনের সঙ্গে।

কথাটা শুনেই বুকটা ধক করে উঠলো নমিতার মার। তবু কথাটা স্পষ্ট করে বলতে বাধলো। কোন রকমে মুখে হাসি টেনে নিভাননী বললেন, তা রয়েছে তো হাতের কাছেই, নিন না দিদি।

সেদিন ওই হাসিটুকু দিয়েই সম্মান বাঁচিয়েছিলেন নিভাননী, জানতেন না, সত্যিই এমন একটা বিয়ের প্রস্তাব আসতে পারে। ভাবতে পারেন নি এই গোপন লজ্জাটুকু ভদ্রমহিলার কানে পৌঁছে দেবেন না তাঁর আত্মীয়টি।

তাই হঠাৎ একদিন ভদ্রমহিলাকে একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে গাড়ি থেকে নামতে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিলেন নিভাননী। আর তার চেয়েও বেশী অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল তাঁর কথাগুলো।

ভদ্রমহিলা তাঁর মোটা শরীরটা টেনে টেনে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বলেছিলেন, কথা তো দিয়েছিলেন সেদিন, আজ পাকা করতে এলাম!

সত্যি, না ঠাট্টা, বুঝতে পারেন নি নিভাননী। যেমন প্রথম প্রথম বুঝতে পারতেন না—নমিতা হঠাৎ যে এক একসময় পাগলামি করে সেটা ইচ্ছাকৃত, না রোগ!

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে, এক বাটা পান শেষ করে ভদ্রমহিলা ওঠবার সময়ে বলেছিলেন, তা হলে বলুন, কখন বিয়ে দেবেন।

নিভাননী তখনও কথাটা নিছক রসিকতা কিনা বুঝতে না পেরে শুধু হেসেছিলেন।

কিন্তু সঠিক একটা উত্তর না নিয়ে যেতে চান নি ভদ্রমহিলা।

নিভাননী এড়িয়ে যাবার জন্যে বলেছেন, বেশ তো, উনি আসুন, জিজ্ঞেস করি, পাঁজিটাজি দেখি।

এড়িয়ে যাবার জন্যেই বলেছিলেন নিভাননী। কিন্তু ভদ্রমহিলা চলে যাবার পর, সতীনাথবাবু আফিস থেকে ফেরার পর, কেমন একটা লোভ উঁকি দিতে শুরু করলো তাঁর মনে।

বেশ তো, মন্দ কি। যদি হয়ই বিয়ে। তিনি তো আর যেচে বিয়ে দিতে যাচ্ছেন না। ওদের যদি মেয়ে পছন্দ হয়ে থাকে। নিজের চোখে দেখেছেন, গল্পগুজব করেছেন নমিতার সঙ্গে, কথা বলেছেন, আদর করেছেন। কই ওঁরা তো কিছু বুঝতে পারেন নি। হলোই বা বিয়ে। এমনো তো হতে পারে, বিয়ের পর সত্যিই ভালো হয়ে গেল নমি। কিংবা ওরা যা ভাবছে আসলে হয়তো তা নয়। পাগল নয় হয়তো। ডাক্তাররাই কি সব সময় বুঝতে পারে। হয়তো ইচ্ছে

করেই নমি মাঝে মাঝে অমন করে। কিংবা বিয়ে না হওয়ার জন্যেই। চোখের চাউনিটা 'ওর হঠাৎ এক একসময় কেমন অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন ভাসা ভাসা হয়ে ওঠে বটে, কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে কিছু ভাবলে সকলের চোখই হয়তো পাগলের মতোই হয়, কে জানে।

সতীনাথবাবুকে বোঝালেন নিভাননী।

সতীনাথবাবুরও যে লোভ না হচ্ছিল এমন নয়। কিন্তু ভয় তাঁর, যদি বিয়ের পর জানাজানি হয়ে যায়। যদি ধরা পড়ে যায় নমিতা বিয়ের রাত্রেই!

তবু মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভেবে সতীনাথবাবু রাজি হলেন।

মেয়ে যদি তাঁর ভাল হয়ে যায়, সুখী হয়—কি যায় আসে একটু দুর্নামের আশঙ্কায়।

রাজী হয়ে গেলেন তিনি। আর রাজী হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিলেন সৌমেনের মা।

বিয়ে হয়ে গেল।

'বিয়ে হয়ে গেল'—কথাটা যত চট করে বলা যায়, বিয়ে সত্যিই তেমন চট করে হয় না। তার রীতিনীতি আছে, স্ত্রী-আচার আছে, হাতে হাত রেখে মন্ত্র পড়ার পাট আছে।

সেই কয়েক ঘণ্টার কথা ভাবলেও রক্ত জল হয়ে যায় সতীনাথবাবুর।

পিঁড়ির ওপর নিয়ে গিয়ে বসানো হয়েছে নমিতাকে। চন্দনের ফোঁটায়, লাল চেলী আর কল্কা-তোলা বেনারসীতে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল তাকে! চোখ জুড়িয়ে যায় এমন রূপের দিকে তাকিয়ে। এমন শুভ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখে।

কিন্তু নিভাননীর বুক কাঁপছে তখন দুরু দুরু করে, সতীনাথবাবু আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করছেন, কন্যা সম্প্রদানের জন্যে মন শক্ত করছেন ভিতরে ভিতরে, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে মেয়ের মুখের দিকে ফিরে

ফিরে তাকাচ্ছেন। এখনই না কিছু একটা করে বসে নমিতা। অস্বাভাবিক কিছু।

না, বোধহয় তেমন কিছু করবে না, ভেবেছিলেন সতীনাথবাবু। এমন কি মেয়ে তাঁর সত্যি পাগল কিনা এমন সন্দেহও হয়েছিল। বেশ তো আর পাঁচটা মেয়ের মতোই লাজুক লাজুক মুখ করে বসে আছে। ঠিক ঠিক মন্ত্র পড়ছে বিড় বিড় করে মাথাটি লজ্জায় নুইয়ে।

প্রায় সব আনুষঙ্গিক শেষ হয়ে এসেছে, শুধু শুভদৃষ্টি বাকী।

মাথার ওপর একখানা চাদর ফেলে বর-কনেকে মুখোমুখি করা হয়েছে চোখাচোখি করে মালা বদল করানোর জন্যে, আর অমনি হঠাৎ হেসে উঠলো নমিতা। কিন্তু হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেল।

বরপক্ষের দু-চারজন দেখলো সে-দৃশ্য। ভাবলে, আচ্ছা বেহায়া মেয়ে তো!

নমিতা কিন্তু সে-কথা একেবারেই বিশ্বাস করলো না। এমন কি চটেও গেল, যখন সৌমেন বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে বললে, শুভদৃষ্টির সময় হাসলে কেন বলো তো? আমাকে দেখে?

নমিতা প্রতিবাদ করলে।—কি যা তা বলছো, হাসলাম কখন?

—বাঃ রে, সবাই তো দেখেছে। শুভদৃষ্টির সময়।

—শুভদৃষ্টি? আকাশ থেকে পড়লো নমিতা। বললে, আমার আবার শুভদৃষ্টি কখন হলো?

সৌমেন কপট রাগে চুপ করে গেল। ভাবলে, ফাজলামি করছে নমিতা। ভাববে না কেন? নতুন বিয়ের পর ফুলশয্যার রাতে সব মেয়েরই একটু লজ্জা-লজ্জা ভাব থাকে। যত স্পষ্ট ভাবেই কথার জবাব দিক না কেন, এতখানি ফাজলামি কেউ করে নাকি? বলে কিনা, শুভদৃষ্টি কখন হলো। বেশ, হয় নি তো হয় নি।

কিন্তু রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে থাকলে তো চলে না। এমন রাত একবার গেলে তো আর ফিরবে না। রাত অনেক পাবে সৌমেন,

নমিতাকে এর চেয়ে আরো অনেক ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায়, বুকের মধ্যে, শরীরের স্পর্শে, জীবনের অন্তরে। কিন্তু এই রাতটা ফিরে পাবে না। তাই কিছুক্ষণ পরেই ফিরে তাকালো সে, মুখ ফেরালো, ফিসফিস করে দু-একটা কথা বললে।

কথা নয়, প্রশ্ন।

আর কি আশ্চর্য, সে প্রশ্নের যে উত্তর ফিসফিস করে দিতে হয়, তা যেন জানে না নমিতা। এমন খোলা গলায় উত্তর দিল যে আড়ি-পাতার দলও খিলখিল করে হেসে উঠলো, দুদ্দাড় করে পালালো।

ভোরের দিকে, ভোরের দিকে নয়, বেশ সকাল হয়ে গেছে যখন, তখন সারা রাত্রি জাগরণের ফলে একটু তন্দ্রার ঘোর এসেছিল সৌমেনের। হঠাৎ ঘোর কেটে যেতেই টেনে টেনে চোখ চাইলো, একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে নমিতা।

খুশী হলো সৌমেন। মৃদু হেসে নমিতাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানলো। আর বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত এক ঝটকায় দূরে সরে গেল নমিতা, খাট থেকে নেমে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সৌমেনের দিকে।—কে আপনি ?

কি যেন বলতে যাচ্ছিল নমিতা, তার আগেই দরজায় ঘা পড়লো। —ছোটঠাকুরপো, এবার ঘুমোও তোমরা, দুপুর হয়েছে।

অর্থাৎ সকাল হয়েছে, ওঠো।

সৌমেন তাড়াতাড়ি খিল খুলে বেরিয়ে আসতেই সৌমেনের বউদি বললে, তোমার শালা যে দিদির সঙ্গে দেখা করার জন্যে অস্থির হয়েছে। ডেকে দাও নমিতাকে।

ডাকতে হলো না, ছোট ভাইটির ডাক শুনেই বেরিয়ে এলো নমিতা, আর তাকে দেখেই সব মনে পড়ে গেল তার। তাই তো, তার যে বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামীর বাড়িতে এসেছে সে। তবে হঠাৎ এত চমকে উঠেছিল কেন সে সৌমেনকে দেখে ? ভুলে গিয়েছিল কেন সব কথা ?

বিয়ের কথা কেউ হঠাৎ ভুলে যায়? তবে নমিতা ভুলে গিয়েছিল কেন? হ্যাঁ, কেমন একটা ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছে, সৌমেনকে দেখে ও একটু বিস্মিত হয়েছিল যেন। তাই না?

সৌমেন ফিরে এসে বললে, তুমি তো চিনতে পারো নি আমাকে, তোমার ভাই চিনবে তো?

—চিনতে পারছি না? তোমাকে? কেন, এ-কথা কেন বলছো? অনুযোগের স্বরে বললে নমিতা।

সৌমেন হেসে বললে, বাঃ রে, তখন যে বললে, কে আপনি?

—এমন বানিয়ে বলতে পারো। লাজুক হাসি হাসলো নমিতা। বিশ্বাসই হলো না তার। একটু চমকে উঠেছিল বটে, ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ছে, কিন্তু তা বলে কি 'কে আপনি' জিজ্ঞেস করেছিল? মিছে কথা।

মিছে কথা, মিছে কথা, মিছে কথা।

শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায় সকলের। সৌমেনের মার, সৌমেনের বউদির। এ কি মেয়ে? বেহায়া, মিথ্যেবাদী। তখনই একটা কিছু করে বসে, একটা কিছু বলে বসে, আর সেকথা বললেই বলে 'মিছে কথা'। বড় জাকে মান্য না করুক, শাশুড়ীকে এভাবে অপমান করে নাকি কেউ।

প্রথম প্রথম সকলেই চটতো। কিন্তু কি করে যেন, একটু একটু করে সবাই বুঝতে পারলো। বুঝতে পারলো? না, তা নয়। কানাঘুষা হতে হতে কিভাবে যেন কথাটা তাদেরও কানে এলো।

শুনলে, ছোট বউ পাগল! নমিতা পাগল। বিয়ের আগে থেকেই পাগল ছিল, বাবা-মা না জানিয়ে বিয়ে দিয়েছে।

সতীনাথবাবুর উদ্দেশ্যে, নিভাননীর উদ্দেশ্যে শাপশাপান্ত করলেন সৌমেনের মা। কিন্তু বিয়ে যখন দিয়েছেন, বউ যখন বদ্ধ উন্মাদ নয়,

চিৎকার করে না, মারে না, কামড়ায় না, স্বাভাবিক চালচলন যখন তার, তখন ও দু-চার মুহূর্তের অস্বাভাবিকতা সহ্য না করে উপায় কি? ফেলে দিতে তো পারেন না।

ফেলে না দিলেও নমিতা যেন বুঝতে পারলো, আগেকার মত সেই আদর যত্ন যেন নেই তার। সৌমেনও যেন ঠিক আগের মত ভালবাসে না তাকে, দু-হাতের আলিঙ্গনে তাকে কাছে টানে না। নমিতার এক এক সময় মনে হয়েছে সৌমেন যেন তাকে ভয় পায়—পাশে শুতে, ঘুমোতে। কেন, কে জানে।

নমিতা বুঝতে পারে না, কেন যে সৌমেন তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে! কেন যে কাছে আসে না! কেন, কেন?

অথচ বড় জায়ের ভাই অশ্বিনী এত কাছে আসে কেন, এমন ভালোবাসার চোখে তাকায় কেন? কী চায় অশ্বিনী? এমন সব বিশ্রী রসিকতা করে কেন?

অশ্বিনীকে একটুও ভালো লাগতো না নমিতার। একটুও না। অথচ কারণে অকারণে লোকটা এ বাড়িতে আসে, সুযোগ পেলেই নমিতার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কথা বলতে চায়। আর আশ্চর্য, কেউ আপত্তিও করে না। এমন কি সৌমেনও না। ও কি বুঝতে পারে না কিছু?

এক একদিন নমিতার ইচ্ছে হয়েছে সৌমেনকে স্পষ্ট করেই বলতে। কিন্তু কেমন একটা লজ্জার জড়তা এসে বাধা দিয়েছে, বলতে পারে নি।

কিন্তু দিনে দিনে যেন সাহস বেড়ে চলেছে অশ্বিনীর। অশ্বিনী ডাক্তারের।

হ্যাঁ, এ বাড়ির সবাই অশ্বিনীকে বলতো অশ্বিনী ডাক্তার। রসিকতা করেই বলতো, কারণ ডাক্তারি পাশ করে অশ্বিনী এ বাড়ির টুকিটাকি চিকিৎসা করতো বিনা পয়সায়।

আর যেদিন নমিতার একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা মতো হলো, অশ্বিনী ডাক্তার

এলো, এসে বসলো খাটের ধারটিতে। বললে, জ্বর বাধিয়ে বসেছেন? দেখি হাতটা।

শুয়ে ছিল নমিতা আর সৌমেন দেওয়ালে আয়না টাঙিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল। লোকটার দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হলো নমিতা।

অশ্বিনীর ব্যবহারে তার চোখের দৃষ্টিতে নমিতা যা দেখতে পায়, বাড়ির আর কেউ তা দেখতে পায় না কেন? এত বিশ্বাস কেন লোকটার ওপর? না কি নমিতার নিজের চোখেরই ভুল?

তবু শেষ পর্যন্ত সৌমেনকে না বলে পারে না নমিতা। বলে, তোমাদের ওই অশ্বিনী ডাক্তার লোক ভালো নয়।

—কেন, হঠাৎ ওকে এত খারাপ মনে হলো কেন তোমার? সৌমেন হেসে প্রশ্ন করলে। নমিতা বললে, কি জানি, মনে হয় আমার।

সৌমেন হেসে উড়িয়ে দেয়। মনে মনে ভাবে পাগলের খেয়াল, কখন যে কি ভাবে! আসলে সৌমেন প্রথম যা সন্দেহ করতো, বিস্মিত হতো নমিতার এক একটা অদ্ভুত ব্যবহারে, সেই সত্যটুকু যখন থেকে জানতে পেরেছে তখন থেকেই নমিতাকে ও ভয় করে আবার তাচ্ছিল্যও দেখায়। মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ, একটা বিদ্বেষ পুষে রেখেছে সৌমেন।

এমনি সময় একদিন একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

নমিতার জ্বর আর ছাড়ে না। যা ইনফ্লুয়েঞ্জা মনে হয়েছিল, দেখা গেল তা অন্য কিছু। তা না হলে জ্বর ছাড়ছে না কেন?

শুধু জ্বর নয়, অশ্বিনীও যেন ছাড়তে চায় না নমিতাকে, প্রতিদিন আসে, দেখে, স্টেথিসকোপ বসায়। দু-একটা রসিকতা করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে যায়। কিন্তু সে ওষুধ খায় না নমিতা। জানালা গলিয়ে ফেলে দেয়। অশ্বিনীকে ওর ভীষণ ভয়, কে জানে কখন কি ওষুধ খাইয়ে দেবে। লোকটা যখন ভালো নয়, তার-দেওয়া ওষুধই বা ভালো হবে কি করে।

এমনি ভাবেই একদিন জানালা গলিয়ে ওষুধ ফেলে দিচ্ছে নমিতা, পিছন থেকে দেখতে পেয়ে সৌমেন বললে, ও কি হচ্ছে ?

চমকে উঠেই ফিরে তাকিয়ে হাসলো নমিতা। কোন উত্তর দিলে না।

আর সৌমেন মনে মনে ভাবলো পাগলের কাণ্ড।

কি আশ্চর্য, নমিতার দু-একটা আকস্মিক ব্যবহার ছাড়া আর কোথাও কোন খুঁত দেখতে পায় নি সৌমেন, নমিতা পাগল হয়ে গিয়েছিল, নমিতা পাগল হয়ে যায় এ খবর শোনার পর থেকে নমিতার সবকিছুর মধ্যেই যেন পাগলামি দেখতে শুরু করলো সে। এমন কি নমিতার সহজ হাসিটাও।

ওষুধ ফেলে দেওয়ার কথাটা অশ্বিনীকে বললো সৌমেন। আর তা শুনে অশ্বিনী বললে, বদ্ধ উন্মাদ ও, বুঝতে পারেন না ? ওষুধ আপনারাই খাইয়ে দেবেন।

বদ্ধ উন্মাদ ও ? এ-কথাটা কানাঘুষো শুনেছে ও বহুবার, বুঝতে পেরেছে বাড়ির লোকের ইশারা-ইঙ্গিতে। আর রাগে জ্বলে উঠেছে ভিতরে ভিতরে।

ও নিজেও জানে, মাঝে মাঝে ওর কি যেন হয়ে যায়। কিন্তু তা বলে ও যা কিছু বলে তাই কি পাগলের প্রলাপ নাকি ? যা কিছু করে পাগলের কাজ

বেশ তাই, অশ্বিনী যা ওষুধ দেবে তা-ই খাবে, যা করবে মুখ বুজে সহ্য করবে।

কিন্তু মুখ বুজে সহ্য করতে পারলো না নমিতা।

দুপুরে হঠাৎ এসে হাজির হলো অশ্বিনী। সৌমেন তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। এমন তো কতদিনই এসেছে অশ্বিনী। ডাক্তার মানুষের কি সময়ের ঠিক থাকে !

আধো-ঘুমন্ত বড়-জায়ের ঘরে বসে দু-চারটে কথা বলেই নমিতাকে

দেখতে এলো আশ্বিনী। প্রতিদিনের মতোই এসে বসলো নমিতার পাশে। একটু অস্বস্তি বোধ করে চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে নিলো নমিতা।

কিন্তু অশ্বিনীর চোখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠলো সে। এ কি নৃশংস ভয়ঙ্কর, উন্মাদ চোখ। হ্যাঁ, ঠিক পাগলের মতো। বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি। হাত দুটো থরথর করে কাঁপছে কেন অশ্বিনীর? নিশ্বাসের শব্দ এত ঘন ঘন পড়ছে কেন? তবে কি অশ্বিনীই পাগল?

ছিটকে দূরে সরে যেতে গেল নমিতা। কিন্তু তার আগেই অশ্বিনীর দুটো কঠিন হাত এসে জড়িয়ে ধরেছে নমিতাকে। নমিতার রুগ্ন অসহায় কোমল যৌবনের শরীরটাকে।

মুহূর্তের আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল নমিতা। আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলে গেল অশ্বিনী। কপট অভিনয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতে স্টেথিসকোপ নিয়ে বললে, কী হলো, চিৎকার করছেন কেন? যন্ত্রণা হচ্ছে?

বড়-জা ততক্ষণে চিৎকার শুনে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার গোড়ায়।

নমিতা তখনও কাঁপছে আর চিৎকার করছে, বেরিয়ে যান আপনি, বেরিয়ে যান। কি ভেবেছেন আপনি আমাকে?

অশ্বিনী হাসতে হাসতে ফিরে তাকালো, বড়-জায়ের সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই বললে, পাগল।

. সৌমেন ফিরে আসতেই তাকে সব কথা বললে নমিতা। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে বললে ও।

কিন্তু তার আগেই সব শুনেছে সে বড়বউদির কাছে। নিজের চোখে নাকি দেখেছে সে, অশ্বিনী কাছে যেতেই নমিতা আর্তনাদ করে উঠলো, বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে অভিযোগ আনলে অশ্বিনীর বিরুদ্ধে। —দেখো নি তো ছোটঠাকুরপো, পাগল হয়ে গেলে কি চেহারা হয়ে যায় ওর।

বড়-জা নিজে বিশ্বাস করে নি, সৌমেনও বিশ্বাস করলো না নমিতার কথা। ভাবলে পাগলের কাণ্ড!

পাগল, পাগল, পাগল!

কিন্তু এই পাগলের কাণ্ড দেখে অশ্বিনীও কি আসা-যাওয়া ছেড়ে দিলো। পরপর কয়েকদিনই এলো না সে।

বড়-জা বললে, তোমার পাগলামির জন্যে বেচারা লজ্জায় আসছে না আর।

শাশুড়ী বললে, অশ্বিনীর মতো ভালো ছেলে, তার নামে এইসব!

সৌমেন বললে, তোমার জন্যে দেখছি একে একে সবাই আমাদের ছেড়ে যাবে।

শুনে চুপ করে রইলো নমিতা। কি যেন ভাবলো। তারপর বললে, অশ্বিনী ডাক্তারকে একবার ডেকে আনবে?

—কেন?

—আমি ক্ষমা চাইবো। সত্যি, পাগলামি করে কি অপমানই না করলাম তাকে। আমি ক্ষমা চাইবো।

বড়-জা সৌমেনের কাছে শুনলো, শুনে বললে, দেখলে তো ছোট-ঠাকুরপো, আমি বলেছিলাম কিনা সব পাগলামি। অশ্বিনী কখনো তাই পারে?

সৌমেন বললে, আমিও জানতাম।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই একদিন অশ্বিনীকে ডাকতে গেল সৌমেন। বললে, পাগলামির ঘোরে অন্যায় করেছে নমিতা, তাই ক্ষমা চাইবে বলেছে। চলুন আপনি।

এলো অশ্বিনী, বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে। ক্ষমা চাইবে নমিতা? বলবে, যা বলেছে সব মিথ্যে? কিন্তু কেন? তবে কি নমিতা নিজেও নিজেকে পাগল ভাবে? না কি সত্যিই সে পাগল? কই কিছুই

তো বোঝা যায় না। হাবে-ভাবে কথায়-বার্তায় কোথাও কোন অসঙ্গতি তো ধরা পড়ে না!

অশ্বিনী এসে দাঁড়াতেই লাজুক মুখ নামিয়ে নমিতা বললে, মাপ করবেন। সেদিন পাগলামি করে কি যে বলেছি, কি যে করেছি! শুনেছি সব, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।

খুশী হলো অশ্বিনী, কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর কাটলো না। তবে কি নমিতা অভিনয় করে

নমিতা বললে, ওষুধ দেবেন আপনার, এবার থেকে ঠিক নিয়ম করে খাবো, দেখবেন।

নিয়ম করেই ওষুধ খেতে আরম্ভ করলো নমিতা। আর নিয়ম করেই আবার আসতে শুরু করলো অশ্বিনী।

আর এমনি ভাবে নিত্যদিন আসা-যাওয়ার ফাঁকে সম্পর্কটা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

মুখে হাসি টেনে কথা বলে নমিতা। ভদ্রতা দেখায়, যেচে কথা বলে অশ্বিনীর সঙ্গে অনর্গল অকারণ।

অশ্বিনী নিজেও আশ্চর্য হয়। তবে কি নমিতার মনে তার প্রতি কোন আকর্ষণ আছে, ছিল, আকস্মিক মুহূর্তেই হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল সেদিন? নাকি এখনই সত্যিকার পাগল হয়ে গেছে নমিতা?

না, নমিতার এই যৌবন, এই শরীরের প্রলুব্ধি থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না অশ্বিনী।

আবার ঘন ঘন আসতে শুরু করে অশ্বিনী। গল্পগুজব করে। কোন্ রুগীর কি হয়েছে, কি ওষুধ দিয়ে সারালো। কোন্ ডাক্তার ষোল টাকা ভিজিট নিয়েও হাল ছেড়ে দিয়েছিল, অশ্বিনী সারিয়ে দিয়েছে।

নমিতা হেসে বলে, বাড়ি যাবেন না?

অশ্বিনী সাহস পেয়ে বলে, যেতে ইচ্ছে হয় না।

হাসল নমিতা। হাসে, মুগ্ধ ভাবে তাকায়, আর মনে মনে জ্বলে। স্বামী তাকে পাগল ভাবে, শাশুড়ী পাগল ভাবে, বড়-জা পাগল ভাবে!

সেদিনও দুপুর বেলায় এসে হাজির হলো অশ্বিনী। নমিতার কথা মত।

বড়-জা ঘুমিয়েছিল। শাশুড়ী ছাদে শুয়ে আছেন বাতের যন্ত্রণায়। নমিতা একা জেগে দাঁড়িয়েছিল জানলার কাছটিতে।

অশ্বিনী এলো।

হাসলো নমিতা। কাছে এলো। তারপর হঠাৎ পাগলের মত দু-হাত বাড়িয়ে অশ্বিনীর গলা জড়িয়ে ধরলো, ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

দুটি উন্মাদ হাতে অশ্বিনীর কণ্ঠনালী চেপে ধরে বললে, ওরা আমাকে পাগল বলে, আপনি পাগল বলেন, আাম পাগল হবো, পাগল। পাগল হয়েই প্রতিশোধ নেব আমি।

হেসে উঠলো নমিতা।

পাগলের হাসি, বদ্ধ উন্মাদের হাসি। কেঁপে কেঁপে উঠলো হাসতে হাসতে, সশব্দে, খিলখিল করে হাসতে হাসতে চিৎকার করে উঠলো, আমি পাগল হবো, আমি পাগল হবো। পাগল।

সে চিৎকার শুনে ছুটে এলো বড়-জা, শাশুড়ী বাড়ির চাকর-বাকর। সবাই দেখলো ফুলে ফুলে উঠছে নমিতার শরীর, ক্রোধে, মত্ততায় আর অশ্বিনীর অচেতন শরীরটা লুটিয়ে পড়ছে দুটি ইস্পাত-কঠিন হাতের আবেষ্টন থেকে ছাড়া পেয়ে।

[১৩৪৯]

ঝাঁসী হয়ে ভূপাল যাবার পথে ভীলসা স্টেশন। স্টেশন থেকে নেমে পশ্চিমের পথ ধরে এক্কা ছুটবে। তারপর বেতুয়া নদী পার হয়ে পৌঁছতে হবে বেশনগরে। বেশনগরের 'খাম্বাবা' এবং তার দু-ক্রোশ দক্ষিণের উদয়গিরি প্রাচীন শিল্পভাস্কর্যই নয়, একটি রোমাঞ্চময় অতীত ইতিহাসকেও স্মরণ করিয়ে দেয়।

গোয়ালিয়র রাজ্যের এই নগরের সন্নিকটেই ছিল প্রাচীন মালোয়া রাজ্যের রাজধানী, এই বেশনগরের দু-দিক থেকে প্রবাহিত হতো বেতুয়া ও ব্যাস-নদীর বিদ্যুৎস্রোত জলধারা। মালোয়ার রাজধানী এই বেশ-নগরেই ছিল বাসুদেবের মন্দির।

স্থানীয় গাইড এই মন্দির-প্রাঙ্গণের একটি সুদীর্ঘ স্তম্ভের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলে, এ হ্যায় খাম্বাবা।

—খাম্বাবা?

প্রশ্নের উত্তরে সে জানালে, এই খাম্বাবা আসলে গ্রীক রাজপুত্র হেলিওডোরাসের তৈরী গরুড়স্তম্ভ। একটি ভারতীয় নারীর সঙ্গে এক গ্রীক যুবকের প্রণয়কাহিনী লুকিয়ে আছে এই স্তম্ভের আড়ালে, এই বাসুদেব-প্রাঙ্গণের নিঃশব্দ বাতাসে ফিসফিস করে কে যেন কানের পাশে কূজন করে যায় অতীতের এক যবন যুবক আর এক মালোয়া রাজকন্যার প্রেমের উপাখ্যান।

খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দে এই স্তম্ভ তৈরী করিয়েছিলেন হেলিওডোরাস, স্তম্ভগাত্রে ব্রাহ্মী হরফে তা কীর্তিত হয়ে আছে। 'পরম ভাগবত' উপাধি-ভূষিত তদানীং গ্রীক রাজপুত্র হেলিওডোরাসের পরিণয়-কাহিনী অপূর্ব একটি প্রেমের উপাখ্যান।

তক্ষশীলায় রাজত্ব করছেন তখন গ্রাকরাজ এন্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া তখন এক সমৃদ্ধিশালী স্বাধীন রাজ্য।

এন্টিসিলিওডিরাস তাঁর রাজ্যকে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে আদেশ দিলেন একটি সহস্রকুঞ্জর বাহিনী গঠন করবার। কিন্তু তক্ষশীলার অরণ্যে তো হাতির হদিস মিলবে না। এন্টিসিলিওডিরাস বুঝলেন, গজবাহিনী গড়ে তুলতে হলে মালোয়ারাজ্যের সাহায্য প্রয়োজন। কারণ মালোয়ার অরণ্যই তখন পশ্চিম ভারতের প্রায় সব রাজ্যকে হাতি সরবরাহ করতো।

তাই মালোয়ারাজের কাছে বাণিজ্য-সন্ধির শর্ত পাঠালেন এন্টিসিলিওডিরাস। মালোয়ারাজ জানালেন, তিনি সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হবেন যদি গ্রীকরাজ পরিবর্তে মালোয়া রাজপুত্রকে গ্রাক রণকৌশল শিক্ষা দেন।

শর্ত গ্রহণ করলেন এন্টিসিলিওডিরাস। মালোয়া রাজপুত্র এসে উপস্থিত হলেন তক্ষশীলায়। গ্রীকরাজ সাদর অভ্যর্থনা জানালেন যুবরাজকে, রাজবংশীয় ডিওনের ওপর ভার দিলেন অতিথিপরিচর্যার। এই রাজবংশোদ্ভূত ডিওনের পুত্রই হেলিওডোরাস।

শ্বেতকেশ ডিওন তাঁর পুত্রকে উপস্থিত করলেন মালোয়া যুবরাজের কাছে। বললেন, আজ থেকে তোমরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের সৌহার্দ্য যেন মালোয়া এবং তক্ষশীলাকেও বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ রাখতে পারে চিরকাল।

হেলিওডোরাস আর মালোয়া যুবরাজ—প্রত্যুষে পাহাড়ী পথ বেয়ে দুই সুপুরুষ সুদর্শন যুবক ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে—প্রজারা দূর থেকে দেখেই চিনতে পারতো এই ভারতীয় আর গ্রীক যুবক দুটিকে। মধ্যাহ্নের অক্ষক্রীড়া, নিশীথের গল্পগুঞ্জনে মেতে থাকতো দুই ভিন্নদেশী বন্ধু!

এইভাবেই সুখে স্বপ্নে দিন কেটে যায় মালোয়া রাজপুত্রের।

মালোয়ার উষ্ণ আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে মালোয়া রাজপুত্র। কিন্তু তক্ষশীলা শীতপ্রধান রাজ্য।

পাহাড়ী ঝরনার গা বেয়ে দুই বন্ধু একদিন পরিভ্রমণ করতে করতে দেখতে পেলো পর্বতচূড়া থেকে তুষার গলে গলে পড়ছে। তুষারের মুকুটে ভূষিত পর্বতশৃঙ্গে ঠিকরে পড়ছে সূর্যের সোনালী রশ্মি। সে-দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হল মালোয়া রাজপুত্র।

বললে, চলো বন্ধু, এই তুষার-গলে-পড়া সলিলে সন্তরণ করে আসি।

হেলিওডোরাস বাধা দিলো, বললে : না বন্ধু। এর রূপে আকৃষ্ট হওয়া এক, এর সলিলস্রোতে স্নান করা অন্য। তুমি উষ্ণপ্রধান দেশের রাজপুত্র, এই শীতল জলধারা তোমার পক্ষে ক্ষতিকর।

তা সত্ত্বেও নিষেধ শুনলো না, হেলিওডোরাসের কথায় সশব্দে হেসে উঠে ঝরনার জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো মালোয়া রাজপুত্র।

তারপর জ্বরবিকার, জীবনসংশয়।

ডিওনের প্রাসাদকক্ষে প্রায় মৃত্যুশয্যায় পড়ে আছে মালোয়া রাজকুমার। হেলিওডোরাস, ডিওন, ডিওনের পত্নী সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করে চলেন বিদেশী রাজপুত্রের। দেবতার পায়ে প্রার্থনা জানান ডিওন-পত্নী, আমার পুত্রের জীবনদান করো প্রভু।

হয়তো ডিওন-পত্নীর প্রার্থনা শুনতে পেলেন দেবতা। মালোয়া রাজপুত্রের রোগ আরোগ্য হলো।

বন্ধুর মাতাকে প্রণাম জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো মালোয়া রাজপুত্র।

মৃদু হাসলেন ডিওন-পত্নী।

বললেন, আমার পুত্রের বন্ধুও আমার পুত্রতুল্য। তোমাকে আমি সন্তানরূপেই দেখেছি বৎস।

মুগ্ধ হলো মালোয়া রাজকুমার। গ্রীকরাজকে অনুরোধ জানালো হেলিওডোরাসকে মালোয়ার দূত নিযুক্ত করবার জন্য।

মালোয়ারাজ পুত্রের চিঠিতে জানতে পারলেন নবনিযুক্ত দূত হেলিওডোরাস তাঁর পুত্রের বন্ধু, তারই মাতার সেবাযত্নে প্রাণ লাভ করেছে তাঁর পুত্র।

তাই যুবক হেলিওডোরাস মালোয়ার দরবারে উপস্থিত হতেই সম্রাট বললেন, বিদেশী যুবক, আজ থেকে তুমি আমারও পুত্র। আমার পরিবারেরই সন্তান তুমি।

রাজপরিবারে রাজপত্নীর স্নেহসিঞ্চনে দিন কেটে চলে হেলিও-ডোরাসের। মাঝে মাঝে রঙিন স্বপ্নের মতো একটি সুন্দর লজ্জারুণ মুখ উঁকি দিয়ে সরে যায় যবনিকার অন্তরালে।

দাসীদের কাছে এই রাজকুমারীর কথা শুনতে পায় হেলিও-ডোরাস। ক্ষণিক রোমাঞ্চের চোখে বিদ্যুতের মতো সে রূপ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

হেলিওডোরাস দরবারে যায়, কখনো মালোয়া পরিভ্রমণে বের হয়, আর ফিরে এসে দেখতে পায় একটি পুষ্পমাল্য তার দ্বারপ্রান্তে পড়ে আছে। কৌতূহল বোধ করে গ্রীক যুবক, মনে আনন্দের গুঞ্জরন ওঠে।

তার মনে রূপবতী রাজকন্যার কটাক্ষমধুর হাসি যে প্রেমের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে, রাজকন্যার মনেও কি জ্বলছে সেই একই শিখা?

না শুধুই কৌতুক? বিদেশিনীর রহস্যঘেরা অভিনয়?

এমনি ভাবেই দিনের পর দিন কেটে চলে। বসন্ত উৎসবের কাল ঘনিয়ে আসে।

সারা মালোয়া রাজ্য পুষ্পেপত্রে শোভিত হয়ে উৎসবের রূপ নেয়। সুমধুর বাদ্যধ্বনি, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় পথপ্রান্তের রাজার প্রাসাদ যেন উচ্ছল হয়ে ওঠে।

বসন্তের লীলাচাপল্যে ভ্রূভঙ্গিমা দেখা দেয় মালোয়া নাগরীদের চোখে। পুরাঙ্গনা, কুমারী কন্যার দল প্রসাধিত সৌন্দর্যের আগুন জ্বালিয়ে মেতে ওঠে বসন্ত উৎসবে।

নৃত্যগীতে নরনারীর অবাধ মিলনের স্বাধীনতা এই একটি দিনের তরে। এই একটি উৎসব যেন সব বিধিনিষেধ, সব সামাজিকতার লজ্জা দূর করে তরুণ তরুণীদের মিলন ঘটায়। এই উৎসবের দিনেই হয়তো মিলনের প্রথম সোপান গাঁথা হয় কারো জীবনে, কেউ বা হতাশ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যথার স্মৃতি নিয়ে যায় মনের গোপনে।

রাজ-পুষ্পোদ্যানে উৎসবের উচ্ছ্বাস, আলো-ঝলমল নিকুঞ্জের বৃক্ষ-ছায়ায় সম্ভ্রান্ত তরুণ-তরুণীদের গুঞ্জরন।

এরই মাঝে একাকী ঘুরে বেড়ায় বিদেশী হেলিওডোরাস। সঙ্গী নেই, সাথী নেই, ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে শুধু মালোয়া রাজকুমারকে। তক্ষশীলায় শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করছে তার বন্ধু।

কিন্তু রাজকুমারী কোথায়

তরুণীদের ভিড়ে বারংবার যেন একটি পরিচিত মুখ খুঁজে বেড়ায় হেলিওডোরাস।

মালোয়া রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা প্রেমিকের বাহুলগ্ন হয়ে বীথিপথে বিচরণ করতে করতে হঠাৎ দেখতে পায় হেলিওডোরাসকে।

সুদীর্ঘ সুপুরুষ বীরের মত সুদর্শন এই বিদেশীকে দেখে মন চঞ্চল হয়ে ওঠে তাদের। ছলনায় প্রেমের বাহু থেকে মুক্তি নিয়ে গোপনে এসে সাক্ষাৎ করে গ্রীক যুবকের সঙ্গে। চোখের ভাষায় প্রণয় প্রার্থনা জানায়।

কিন্তু হেলিওডোরাসের মনে শুধু একটি সুরের গুঞ্জরন। সে সুর রাজকুমারীর কণ্ঠে বাঁধা।

ব্যর্থ বিফল আক্রোশে সুন্দরীর দল একে একে বিদায় নেয়, কৌতূহলের চোখে লুকিয়ে জানতে চায় কে এই দিব্যপুরুষের প্রণয়-ভাগ্যবতী।

হেলিওডোরাসের কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বীথিপথ ধরে কেবলই রাজকন্যাকে খুঁজে বেড়ায় হেলিওডোরাস।

তারপর কোলাহল, জনতা দূরে রেখে ধীরে ধীরে একটি প্রায়ান্ধকার তুলসীকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যায় হেলিওডোরাস। দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে শান্তিতে বসে থাকতে চায় সবুজ ঘাসের শীতল আসনে।

কিন্তু তুলসীকুঞ্জের দিকে এগিয়ে যেতেই ক্ষীণ সুরের গান শুনতে পায় গ্রীক যুবক। গান নয়, যেন বিষণ্ণ বেদনায় রোদনভরা এক নারীকণ্ঠ।

দূর থেকে দেখতে পায় হেলিওডোরাস। আনন্দে নেচে ওঠে তার মন।

নির্জনে একাকিনী একটি দোলনায় বসে শান্ত কণ্ঠে গান গাইছে রাজকুমারী। চোখের ম্লান দৃষ্টিতে যেন কান্না চাপা আছে।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজকুমারীর রূপসুধা পান করে হেলিও-ডোরাস। কবরী ঘিরে পুষ্পের মুকুট, গলায় কুসুমের মাল্য। মণিবন্ধে চামেলী চম্পার অপরূপ কঙ্কণ। কটীতে পুষ্পের চন্দ্রহার। আর দুটি সুন্দর চরণে রক্তিম অলক্ত রেখা।

ধীর পায়ে রাজকুমারীর পিছনে এসে দাঁড়ায় হেলিওডোরাস।

কবিতার ছন্দে বলে ওঠে, হায়, যদি হতেম আমি পুষ্পবীথিকা, দেবীর চরণ স্পর্শ করে ধন্য হতেম আজ!

পুরুষকণ্ঠ শুনেই চমকে ফিরে তাকায় রাজকুমারী।

এসেছে! তার গোপন মনের প্রণয়পুরুষ এসেছে!

লজ্জায় অধোবদন হয়ে কাছে এসে দাঁড়ায় রাজকন্যা।

হেলিওডোরাস হাত বাড়িয়ে রাজকুমারীর চিবুক তুলে ধরে। দু-টি লজ্জারুণ চোখ তুলে তাকায় রাজকন্যা, মৃদু হাসিতে প্রণয় স্বীকৃতি জানায়।

দু-টি সবল বাহুর আলিঙ্গনে ধরা দেয় রাজকন্যা। আপন পুষ্প-মাল্য পরিয়ে দেয় হেলিওডোরাসের গলায়।

গ্রীক যুবক প্রশ্ন করে, কি নাম তোমার রাজকন্যা?

শান্ত উত্তর আসে, মাধবিকা।

হেলিওডোরাস পুনরায় কবিতার ছন্দে বলে, হায়, যদি হতেম আমি পুষ্পবীথিকা, দেবীর চরণ স্পর্শ করে ধন্য হতেম আজ! সুন্দরী হায় অনেক আছে, কুঞ্জে ফোটে একটি মাধবিকা, যাহার কাছে তুচ্ছ সবই, তুচ্ছ হবে তক্ষশীলারাজ॥

মাধবিকা বলে, না ভদ্র, এই সামান্যা নারীর প্রেমই তুচ্ছ রাজ ও রাজৈশ্বর্যের কাছে। আজ মদনোৎসবের মত্ততায় যাকে আলিঙ্গনের সম্মান দিলে বিদেশী বন্ধু, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তাকেই ভুলে যাবে তুমি।

হেলিওডোরাস বললে, তোমার চরণে শপথ রেখে গেলাম রূপময়ী, তোমার প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে কোনো দুরূহ কার্যেই পশ্চাৎপদ হবো না।

মাধবিকা আশ্বাস দিলো, আমিও আজ বসন্তলগ্নে শপথ নিচ্ছি, আজ থেকে আমি তোমার বাগদত্তা, কোনো বাধানিষেধ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না আমাদের মধ্যে।

বিদায় নিয়ে চলে গেল মাধবিকা, বিদায় নিয়ে গেল হেলিওডোরাস।

কিন্তু ঈর্ষাকাতর সুন্দরী যে-সব ললনারা গ্রীক যুবকের রূপে আকৃষ্ট হয়ে উপযাচিকার মতো এসে দাঁড়িয়েছিল হোলিওডোরাসের কাছে, প্রত্যাখ্যানে যাদের রূপকে অপমান করেছে ডিওনপুত্র, তারা লুকিয়ে দেখলো রাজকন্যার প্রণয়। মালোয়ারাজের কাছে সে-খবর পৌঁছে দিলো তারা।

বৈষ্ণব মালোয়ারাজ উষ্মায় অন্ধ হলেন। একি বিধর্মীর আচার তাঁর পরিবারে।

কন্যাকে প্রশ্ন করলেন, সত্য বলো মাধবিকা, গ্রীকদূতের সঙ্গে কোন গোপন শপথ করেছো তুমি?

মাধবিকা নতশিরে স্বীকার করলো অভিযোগ।

মালোয়ারাজ বললেন, কিন্তু এ বিবাহ হতে পারে না মাধবিকা, বাসুদেবের পূজারী মালোয়ারাজের কন্যার পাণিগ্রহণ করতে পারে না যবন গ্রীকদূত।

রাজপ্রাসাদ থেকে হেলিওডোরাসকে বিতাড়িত করলেন মালোয়ারাজ। বললেন, দূত অবধ্য, তাই তোমার প্রাণ সংহার করলাম না গ্রীকদূত, কিন্তু এই প্রাসাদে আর কোনদিন যেন তোমার পদক্ষেপ না ঘটে।

—কেন সম্রাট? প্রশ্ন করলো হেলিওডোরাস।

মালোয়ারাজ বললেন, মাধবিকার বিবাহ একমাত্র বৈষ্ণব বংশেই হতে পারে বিদেশী, বাসুদেবের উপাসকের হাতেই কন্যা সম্প্রদান করবো আমি।

হেলিওডোরাস বললে, আমি কি যবন ধর্ম ত্যাগ করে বাসুদেবের ধর্ম গ্রহণ করতে পারি না সম্রাট?

সম্রাট উত্তর দিলেন, দ্বাদশ বর্ষ ধরে বাসুদেবের সাধনা করলে তবেই বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করতে সমর্থ হবে তুমি।

—দ্বাদশ বর্ষ!

গোপনে দাসীর হাতে প্রেমলিপি দিয়ে মাধবিকার কাছে বিদায় জানালো হেলিওডোরাস। দ্বাদশ বর্ষ। মাধবিকা, সারা জীবন ধরে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে বাসুদেবের সাধনা করতেও রাজি আছি তোমার প্রেমের সম্মান রক্ষা করার জন্যে।

দূতের পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে বাসুদেবের মন্দিরপ্রান্তে সাধনায় মন নিয়োগ করলো হেলিওডোরাস। রাজার বিচারে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে বৈষ্ণবরূপে।

এমনি বছরের পর বছর কেটে চলে।

মাধবিকার প্রতিজ্ঞা, বাগদত্তা সে, দ্বিতীয় বিবাহ তার হতে পারে

না। ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হলো মাধবিকা। রূপ ম্লান হলো তার।

এদিকে সাধনায় রত গ্রীক যুবকের হিন্দুধর্মপ্রীতি, হিন্দু দেবদেবীর প্রতি নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হলো মালোয়ার প্রজাবর্গ।

রাজার কাছে অনুরোধ জানালো তারা, এই গ্রীক যুবকের সঙ্গেই রাজকন্যার বিবাহ দিন সম্রাট।

কন্যার প্রতি স্নেহবশত সম্মত হলেন মালোয়ারাজ।

কিন্তু হেলিওডোরাস তার দ্বাদশ বর্ষের সাধনা সমাপ্ত না করে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করবে না!

বছরের পর বছর কেটে চলে।

দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হবে আজ। সারা মালোয়ারাজ্য উৎসবের আনন্দে মুখরিত। বিবাহের মণ্ডপে গীতবাদ্যের অবিশ্রাম ধ্বনি। সুন্দরী ললনাদের ভিড়। পুষ্পে লতায় সমস্ত প্রাসাদ সুসজ্জিত, দীপালোকে আলোকিত সমগ্র নগর।

রাজপ্রাসাদের শঙ্খধ্বনি আর কোলাহলের মধ্যে উদগ্রীব হয়ে গবাক্ষে অলিন্দে অপেক্ষা করে পরিবারের সকলে, পুরাঙ্গনারা ভিড় করে দাঁড়ায় পথের দু-পাশে।

কিন্তু একি! বরবেশে নয়। ত্যাগের গেরুয়া ভূষণে বিভূষিত হেলিওডোরাস হেঁটে চলে বিবাহমণ্ডপের দিকে।

বিস্ময় গোপন করেন মালোয়ারাজ। জামাতাকে আহ্বান জানিয়ে কন্যা সম্প্রদান করেন। মাধবিকা চোখ তুলে তাকায় হেলিওডোরাসের দিকে, পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেয় গ্রীক যুবকের কণ্ঠে। হেলিওডোরাস পরিবর্তে তার কণ্ঠের ভক্তমাল্য পরিয়ে দেয় মাধবিকার গলায়।

বলে, চলো মাধবিকা, এ ঐশ্বর্য এ বিলাসের মধ্যে আর ডুবে থাকতে চাই না। চলো মাধবিকা, প্রেমের চেয়েও বড়ো আকর্ষণ দেখতে পেয়েছি, তোমাকেও দেখাতে চাই সেই পথ।

—কি পথ স্বামী ? প্রশ্ন করে মাধবিকা, কি আকর্ষণ ?

হেলিওডোরাস বলে, ভক্তি, মাধবিকা। প্রেমের চেয়েও উচ্চ আনন্দ এই ভক্তি। বাসুদেবের চরণে আশ্রয় নেবে চলো।

মাধবিকা সায় দেয় তার কথায়।

বলে, চলো, তোমার পথই আমার পথ, তোমাকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন আমার আশ্রয়ও তিনি।

ধীরে ধীরে বাসুদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হলো এক যবন রাজদূত। আর এক মালোয়া রাজকন্যা।

দু-হাজার বছর আগেকার সেই বাসুদেবের মন্দির আজ নেই, কিন্তু ভীলসা শহরের পাথরের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। দেখতে পাওয়া যায় বেতোয়া নদীর অপর পারে উদয়গিরির গুহাসৌন্দর্য।

আর স্থানীয় গাইড এই অপরূপ উপাখ্যান বর্ণনা করে সুদীর্ঘ স্তম্ভটির দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে বলে, এ হ্যায় খাম্বাবা !

ব্যাপারটা ঘটেছিল গত পূজোর সময়। কিন্তু এমন ঘটনা বোধহয় প্রতিদিনই ঘটছে, প্রতি মুহূর্তে।

তিন টাকা বারো আনা দিয়ে এক জোড়া জুতো কিনেছিলাম, আমার আড়াই বছরের মেয়ের জন্যে। তার ছোট ছোট পায়ের মাপমতো এক জোড়া লাল টুকটুকে জুতো খুঁজে বের করেছিলাম অনেক ঘুরে, অনেক ভিড় ঠেলে।

বুলার তখনই দু-দশটা বুলি ফুটেছে মুখে, আধো-আধো উচ্চারণের দু-একটা পাকা পাকা কথাও।

পূজোর সময় সকলের জন্যেই কিছু না কিছু কেনা হয়, কেনাকাটাই রীতি।

তাই বুলাকে কাছে ডেকে বললাম, তুমি কি নেবে বুলা? কি আনবো তোমার জন্যে?

বুলা অবশ্য ওর নাম নয়। অর্থাৎ ওর নাম নেই। ছিল না। কেউ বুড়ি বলে, কেউ বা খুকু। কে যেন বুলাই বলতো, আর কেউ কেউ নানান সুন্দর সুন্দর দুরূহ-উচ্চারণ নামে ডাকতো। শেষ অবধি কোনটা ধোপে টিঁকবে জানি না।

আমি বললাম, তুমি কি নেবে বুলা? কি আনবো তোমার জন্যে?

আধো-আধো উত্তর দিলো বুলা।—দুতো।

হেসে বললাম, দুটো তো বুঝলাম, কি? লজেন্স?

—না, না, দুতো। প্রতিবাদে মাথা নাড়লো বুলা।

'দুতো' যে 'দুটো'র শিশুভ্রংশ, সে বিষয়ে সন্দেহ করার কারণ ছিল না। তাই একে একে অনেক জিনিসের নাম করে গেলাম। অর্থাৎ

কোন্ জিনিসটি চায় সে, জেনে নেবার জন্যে। আর প্রতিবারেই সে সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, না, না, তুতো।

শেষ পর্যন্ত সে বোধহয় আমার বুদ্ধি সম্পর্কে নিরাশ হয়েই বললে, তুতো দানো না, তুতো? পায়ে থাকে? বলে নিজেই ছুটে গিয়ে তার দাদুর ভারী চটিজোড়া পায়ে গলিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এলো।

আমরা সবাই হেসে উঠলাম।

বুঝলাম, প্রশ্ন করার আগেই বোঝা উচিত ছিল। কারণ সারাটা দিন এই একটিই কাজ বুলার। কেউ জুতো খুলে রাখলেই হলো। বুলা তার জুতো, চটি বা স্যাণ্ডেলের ফোকরে আড়াই ইঞ্চি মাপের ক্ষুদে ক্ষুদে পা জোড়া ঢুকিয়ে দেবে, আর সারা বাড়ি টেনে টেনে বেড়াবে সেই জুতোজোড়া। এবং শেষ পর্যন্ত সেটা যে কোথায় রেখে আসবে, ঠিক ঠিকানা নেই। খুঁজে বের করা দুরূহ।

তাই সকলেই একবাক্যে বললে, হ্যাঁ, ওর জন্যে একজোড়া ভালো দেখে জুতো কিনতে হবে।

বাবা বললেন, সেই মখমলের জুতো চাই—লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির কাজ……

বললাম, ওর জন্যে আবার দামী জুতো!

সকলেই প্রতিবাদ করে উঠলো তীব্র স্বরে।—দামী জুতো তো ওদের জন্যেই।

বাবা শুধু বললেন, দামী কেন হবে, এক টাকা দু আনা করে তো দাম ছিল।

এক টাকা দু আনা! হেসে বললাম, সে মান্ধাতার আমলে ছিল।

বাবা বললেন, মান্ধাতার আমল নয়, এই উনচল্লিশ সালেও ছিল। মঞ্জরীর মেয়ের জন্যে কিনেছিলাম সেবার। তা সব জিনিস তো চার

গুণ দাম বেড়েছে, গবর্নমেণ্টই বলে, তা হলে এখন দাম বড় জোর সাড়ে চার টাকা!

নিজের পকেটের দৌড় যাই হোক না কেন, সাড়ে চার টাকা দামের কোন জিনিসকে আজ আর দামী বলার উপায় নেই। মাছ হঠাৎ একদিন আড়াই টাকা সের পাওয়া গেলে রীতিমত উল্লাস দেখা দেয় সকলের মুখেচোখে, আপিসে সারাটা দিন আলোচনা চলে—মাছ সস্তা হয়ে গেছে।

তাই বাধ্য হয়েই বলতে হলো, দেখবো যদি পাওয়া যায়।

পাওয়া যে যাবে না, আমি জানতাম। প্রথম প্রথম বুলাকে সঙ্গে নিয়েই দোকান দোকান ঘুরলাম। শু-শোভিত ফুটপাথের দেওয়াল থেকে বড় বড় দোকান অবধি।

শেষে আশাভরসা ছেড়ে দিয়ে বুলার ছোট ছোট পায়ের মাপ নিতে হলো কাগজের ওপর পেন্সিলের দাগ কেটে। এবং সেটা কাবুলিওয়ালার মেয়ের পাঞ্জার ছাপের মত সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে সারা কোলকাতা চষে বেড়াতে হলো।

একটা করে দোকানে ঢুকি আর রেডিওর অনুরোধের আসরের রেকর্ড বাজানোর মত একই অনুরোধ বারবার: লাল মখমলের ওপর সোনালী জরির……

কথা শেষ করার আগেই দোকানদার না-বাচক ঘাড় নাড়ে। কেউ কেউ সতেরো রকমের চামড়ার নাম করে, কেউ বা বলে, ওসব আজকাল চলে না মশাই, প্লাস্টিক নিন, প্লাস্টিকের নতুন ডিজাইন……

আমার বাড়ির গলির মুখেই তো কয়েকটা জুতোর দেয়াল আছে, তা হলে আর এতো দূর আসবো কেন।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হলো, কারণ একজোড়া মনের মত জুতো খুঁজতে খুঁজতেই সপ্তমীর দিন এসে গেল।

সুতরাং বাধ্য হয়েই সাদাসিধে এক জোড়া জুতো কিনে আনতে

হলো তিন টাকা বারো আনা দিয়ে। লাল টুকটুকে এক জোড়া জুতো। দু পাশে দুটো সাদা বোতাম।

আর সে জুতো পেয়ে কি ফুর্তি বুলার।—আমার দুতো? আমার?

বললাম, হ্যাঁ, তোমার।

জুতোমোজা পরিয়ে দিতেই গটগট করে হাঁটতে শুরু করলো সে, ওপর নীচে, এঘর ওঘর। যেন কত বড় একটা সম্পদ পেয়েছে শুধু কি তাই, বোধহয় জুতো পেয়ে সে নিজেকে অনেক বড় মনে করলো, ভাবতে পারলো, সেও বড় হয়েছে। তার চোখে জুতোটাই বোধহয় প্রবীণতার একমাত্র প্রতীক।

তিন টাকা বারো আনার মধ্যে যে কারো এক-পৃথিবী আনন্দ থাকতে পারে, তার আগে কোনদিন মনেই হয় নি।

সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরে দেখি, সামনের গলি দিয়ে কাতারে কাতারে লোক চলেছে প্রতিমা দেখতে। সমস্ত শহরটাই যেন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শাড়ি, গাড়ি, আলো, বাজনা। সকলের কাছেই বুঝি এমনি এক একটা তিন টাকা বারো আনার বৃত্তে পৃথিবীর সব আনন্দ বাঁধা আছে। দোষ কি আড়াই বছরের ছোট্ট মেয়ে বুলার!

কিন্তু বাড়ি ঢুকতেই দেখি সকলেই কেমন বিচলিত। বাবার মুখ গম্ভীর, আরো গম্ভীরতা আড়াই বছরের ছোট্ট মুখে।

কি ব্যাপার।

ব্যাপার গুরুতর। বুলার এক পাটি জুতো পাওয়া যাচ্ছে না।

পাওয়া যাচ্ছে না? কেন? কি হলো?

শুনলাম একে একে।

সকলেই যখন নিজের নিজের সাজ-পোশাক নিয়ে ব্যস্ত, প্রতিমা

দেখতে যাবার জন্যে, তখন বাচ্চা মেয়েটাও ব্যস্ততা দেখিয়েছিল। জুতোমোজা পরিয়ে দিতে বলেছিল। আর যে-হেতু তাকে বলা হয়েছিল, আমরা আগে কাপড় পরে নিয়ে তোমাকে জুতো জামা পরিয়ে দেবো, সেই কারণে রেগে গিয়ে একপাটি জুতো জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়েছে সে।

ফেলে যে দিয়েছে তা স্বীকার করেছে বুলা নিজেই। এবং ফেলে দিয়ে মুখ গম্ভীর করে বসে আছে সে।

চাকর-ঠাকুর, বাবা, আমি—সকলে মিলে নীচের রাস্তা, ফুটপাথ তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম।

না, কোথাও নেই। হয়তো এই চলমান ভিড়ের পায়ে পায়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়েছে এক পাটি জুতো।

মনটা সকলেরই খারাপ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত যদি বা একজোড়া জুতো কেনা হলো, তা একটা দিনও পরতে পেলো না! পূজোর দিন কটাও পরতে পেলো না বেচারী।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর হাল ছেড়ে দেওয়া হলো। ভাবলাম, সকালে গিয়ে আরেক জোড়া কিনে আনবো। আরো তিন টাকা বারো আনা। তা হোক।

কিন্তু সকালে গনশা বাজার থেকে ফিরে এসেই খবর দিলে, জুতোটা পাওয়া গেছে।

—পাওয়া গেছে?

গনশা বললে, হ্যাঁ, পাওয়া যাবে।

সে আবার কি কথা!

সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হেসে বাঁচি না। বলে কি! তাও কি কখনো হয়। গণেশ নিশ্চিত মিছে কথা বলছে। আর মিছে কথা বলাটাই তো ওর পক্ষে স্বাভাবিক। অর্থাৎ ওর সব কথাই যেখানে অবিশ্বাস্য মনে করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সেখানে সত্যিই কিছু

অবিশ্বাস্য বলে বসলে বিশ্বাস করবো কি করে। এককালে যা কিছু হারাতো, গিন্নীরা বলতেন, কেষ্টা বেটাই চোর। এযুগে সেটা স্পষ্ট করে বলার সাহস কারো নেই, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এযুগের কেষ্টারা কাঁধে শার্ট ফেলে পকেট থেকে চিরুনি বের করে অ্যালবার্ট কেটে টিনের স্যুটকেসটি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। এবং তারপর ভোরে উঠে কয়লা ভাঙা থেকে শুরু করে রাত্তিরে মশারি টাঙানো অবধি শুনতে হবে, আনতে তো পারো না একটা, চাকর-ঠাকুর তাড়াতেই ওস্তাদ······ ইত্যাদি।

তাই ভয়ে ভয়ে বললাম, দূর, তাই কখনো হয়।

গণেশ গলার স্বর চড়ালো।—দেখে এলাম আমি, চলুন না দেখিয়ে দিচ্ছি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক পাটি হারানো জুতো পাওয়া গেছে, অর্থাৎ এক পাটি জুতোর হদিস পাওয়া গেছে। গলির মোড়ের অসংখ্য দেয়াল-দোকানের একটিতে নাকি সেটি টাঙানো আছে—নীচে দাম লেখা আছে বারো আনা।

রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছে তারা—একথা নাকি স্বীকার করেছে, কিন্তু বারো আনা দাম দিয়ে কিনতে হবে।

হারানো জিনিস কুড়িয়ে পেলে অনেকে ফেরত দেয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, পুলিসে জমা দেয়, কত কি তো জানা ছিল। এমন কথা কখনো শুনি নি যে, একপাটি জুতো, তাও কুড়িয়ে পেয়েছে—অথচ দাম দিতে হবে।

গেলাম সে দোকানে। অন্য পাটি জুতো হাতে নিয়ে।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছে গণেশ। সেই হারানো পাটিটাই।

বললাম, কুড়িয়ে পেয়েছেন তবু দাম নেবেন কেন?

দোকানী চড়া গলায় বললে, দাম ছাড়া কোন্ জিনিসটা আজকাল পাওয়া যায় মশাই?

বললাম, এক পাটি জুতো, আমি না নিলে তো বিক্রি হবে না।

দোকানদার হাসলো।—আপনিই কিনবেন স্যার, বারো আনা দিয়ে। তিন টাকা তো আপনার লাভ হবে।

দামটাও জানে তা হলে! কিন্তু কেমন একটা গোঁ চেপে গেল হঠাৎ মনে হলো, রবীন্দ্রনাথের কথাই ঠিক, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তু জনেই সমান অপরাধী। ইচ্ছে হলো, পুলিসে দিই লোকটাকে। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝলাম, কাজ হবে না তাতে, উল্টে আমাকেই হয়রান হতে হবে।

ফিরে এলাম বাড়িতে। ভাবলাম, দিনে দিনে সমস্ত দেশটা কত বদলে গেছে। টাকা ছাড়া আর কিছুই চেনে না আজকের মানুষ। এক পাটি জুতো কুড়িয়ে পেয়েও টাকা রোজগারের ফিকির খোঁজে।

বাড়িতে ফিরে এসে বললাম, নেবো না ও জুতো। আমার তিন টাকা লোকসান হয় হোক, ওকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

তারপর রেগে গিয়ে হাতের এক পাটি জুতো ছুঁড়ে ফেলে দিলাম রাস্তায়। ছুঁড়ে ফেলে দিলাম বলবো না, যেন ছুঁড়ে মারলাম। ওই অর্থলোভী দোকানীর উদ্দেশেই নয়, আজকের অর্থগৃধ্নু সমাজের উদ্দেশে, আজকের ন্যায়নীতিবর্জিত মানুষের উদ্দেশে।

একটা অদ্ভুত আনন্দ পেলাম পর-মুহূর্তে, যেন একটা মস্ত বড় লোভ জয় করেছি। একটা সৎ কাজে তিনটি টাকা বিসর্জন দিয়েছি।

পুনশ্চ—জীবনের এই ছোট্ট ঘটনাটিকে যেখানে শেষ করলাম, সেই অবধি লিখলে তুচ্ছ এই কাহিনীটুকু গল্প হতে পারতো। আরো চটকদার গল্প হতো যদি বলতাম, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া পাটিটাও পরের দিন দেখলাম সেই দোকানের দেয়ালে, হারানো পাটিটার পাশে। কিন্তু যে-হেতু গল্পের চেয়েও বড় কথা জীবন, তাই শেষটুকুও বলা প্রয়োজন।

অর্থাৎ জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরক্ষণেই বোকামি বুঝতে পেরে নিজেই গিয়ে সেটা কুড়িয়ে এনেছিলাম এবং তারপর গলির মোড়ের দোকান থেকে বারো আনা দিয়ে হারানো এক পাটি জুতোকে উদ্ধার করে তিনটি টাকা বাঁচিয়েছিলাম। ন্যায়নীতির দম্ভ টেঁকে নি। কারণ আমিও তো আজকের মানুষ!